অন্য বসন্ত

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৭১

প্রচ্ছদপট : অঙ্কন
ইন্দ্রনীল ঘোষ
মুদ্রণ : স্ট্যান্ডার্ড প্রিন্টিং অ্যান্ড কোং

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড,
কলকাতা ৭০০ ০৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

সদ্য অকাল প্রয়াত মেজদা
ধ্রুব ভট্টাচার্যর স্মৃতির উদ্দেশে

রাতে যে আজ বাড়ি ফেরা হবে না, হিসেবে ছিল না তন্নিষ্ঠার। সকলে মিলে এমন জোরাজুরি শুরু করে দিল! মালবিকা হাত ধরে বলছে তনু প্লিজ, বন্ধুরা টানাটানি করছে, রাতভর চলবে অনন্ত হা হা হি হি—এসব ফেলে চলে যেতেও কি মন চায়! এমনিই তো কলেজ ইউনিভার্সিটির বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ এখন, মালবিকার বিয়ে উপলক্ষে তাও অনেক দিন পর কজন একসঙ্গে মিলল, আবার তারা কবে একত্র হবে তার ঠিক কী!

সাড়ে এগারোটা বাজে। সুসজ্জিত বিশাল হলঘরের কোণে রাখা ঢাউস বক্সদুটো সন্ধে থেকে নিচু গ্রামে সানাই-এর বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছিল, থেমেছে এইমাত্র। খাওয়া-দাওয়াব পাট শেষ, কেটারারের লোকজন বাসন গোছাচ্ছে। উজ্জ্বল আলোকিত ধবে যত্রতত্র ভ্রাম্যমাণ গুটিকয়েক পুলক-ক্লান্ত নিকটাত্মীয়, লম্বা লম্বা সোফায় এদিক ওদিক ঘুমন্ত বাচ্চা, এলোমেলো ছড়ানো চেয়ার, পায়ে পায়ে মলিন হয়ে আসা শ্বেতশুভ্র চাদরে রঙিন কাগজের টুকরো, গড়াগড়ি খাওয়া শূন্য কোল্ড ড্রিংকসের বোতল, পিষে যাওয়া ফুল, ছেঁড়া মালা, বাতাসে চাপা আঁশটে গন্ধ—বিয়েবাড়ি এখন ভাঙা হাট।

অনেকক্ষণ আগেই ভেলভেটের সিংহাসন থেকে নেমে পড়েছিল মালবিকা সুপ্রিয়, তারা এখন রাজা রানির মতো বন্ধুদের মাঝে আসীন। জোর গজল্লা চলছে। উদ্দেশ্যহীন সংলাপের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে হাসি। বিচিত্র বিভঙ্গে। কেউ লুটোপুটি খায়, কেউ পাশের জনকে কিল মারে, কেউ বা পাগলের মতো মাথা ঝাঁকায়, কেউ দাঁত বার করে শুধু ফিঁচ ফিঁচ।

তার মধ্যেই মালবিকাব ছোটমাসি কোত্থেকে যেন উড়ে এল। হাতে কাচের প্লেট, তাতে ইয়া বড় বড় রাজভোগ। সুপ্রিয়কে বলল,—হাঁ করো, মালা তোমাকে এটা খাইয়ে দিক।

ব্যাঙ্ক-অফিসার সুপ্রিয় বেশ রগুড়ে ধরনের ছেলে, এতক্ষণ মাঝে মাঝে টুকরো টাকরা জোক শোনাচ্ছিল, রাজভোগের সাইজ দেখে সে প্রায় আঁতকে উঠল—ওই জিনিস আমায় গিলতে হবে?

—বারে, বউ মিষ্টিমুখ করাবে না? নাও নাও, হাঁ করো। এই মালা, তোল না একটা।

—ওই মিষ্টি গিলতে যে আমায় জলহস্তীর হাঁ করতে হবে মাসি!

—করবে। জলহস্তী না হলেও তুমি আজ গণ্ডার তো বটে। সব সহ্য করতে হবে।

সুপ্রিয়র দুই বন্ধুও থেকে গেছে রাতে। প্রত্যূষ আর অভিমন্যু। প্রত্যূষ একটু বাচাল ধরনের, হাস্যরোলের মাঝে ফস করে বলে উঠল,—রাজভোগ কেন?

মালবিকা অন্যভাবে মিষ্টিমুখ করাক।

—সে তো করাবেই। তাড়া কীসের? মালবিকার মাসিও তুখোড় মহিলা, ঝপ করে ঘুরে তাকিয়েছে প্রত্যুষের দিকে,—অ্যাই ছেলে, তোমার বিয়ে হয়েছে?

—কই আর। ওই আশায় আশায় তো এখানে আসা। যদি একটা কোনও খেঁদিবুঁচি জুটে যায়!

—খুব বুলি, অ্যাঁ? পিট পিট চোখ ঘোরাল মালবিকার মাসি,—এই তন্নিষ্ঠা, এই কোয়েল, এই পর্ণা, তোরা বাসর করছিস না? এটাকে ভাল করে রগড়াস তো।

ঈপ্সিতা সবার আগে বলে উঠল,—ও ফাইন। অফকোর্স উই ক্যান হ্যাভ এ বাসর। টু হ্যাভ সাম মজা। আইডিয়াটা হোয়াই ডিডনট কাম আগে?

শেখর পাশ থেকে আলগা চাঁটি মারল ঈপ্সিতাকে,—অ্যাই, ল্যাংগোয়েজটা ঠিক কর।

—কেন, আমি কী ভুল বলেছি?

বিচিত্র উচ্চারণে বাংলা বলে ঈপ্সিতা। সুপ্রিয়ও মুখ টিপে টিপে হাসছে। তবে বাসরের প্রস্তাবটা ধরে গেছে। আজকাল বেশির ভাগ পরিবারেই শালা-শালির সংখ্যা অপ্রতুল, বাসর জাগতে বন্ধুরাই ভরসা।

হলের লাগোয়া বড়সড় ঘর আছে একখানা। হইহই করে সকলে এগোচ্ছিল সেদিকে, তন্নিষ্ঠা দু পায়ে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল,—তোরা যা, আমি একটু নীচ থেকে আসছি।

মালবিকা উৎকণ্ঠিত চোখে তাকাল,—কেন, নীচে কী আছে?

—একটা ফোন করতে হবে বাড়িতে। পাশে এস টি ডি বুথ আছে না?

—কী দরকার এত রাতে ঝামেলা করার? মাসিমা মেসোমশাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওঁরা জানেন আমার বিয়েতে এসে তোকে থেকে যেতে হবে।

সুপ্রিয় আজ থেকে একজন বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরুষ। মুখে চোখে সে ভারিক্কি ভাব আনল,—না না, ফোন করে দিয়ে আসাই তো ভাল। তাঁরা যদি অনর্থক টেনশান করেন, সে ভারী বিশ্রী ব্যাপার হবে।

প্রত্যুষ গলা বাড়াল,—আমি কি সঙ্গে যাব?

তন্নিষ্ঠা মুচকি হাসল,—লাভ কী? আমি তো খেঁদিবুঁচি নই।

প্রত্যুষ পাল্টা জবাব ছোড়ার আগে তন্নিষ্ঠা হরিণপায়ে সিঁড়িতে। আজ তার তরতরিয়ে নামার উপায় নেই। একে শাড়ি পরার অনভ্যাস, তায় পরনে বেজায় ভারী মার ব্রোকেড বেনারসি। জুতোর হিলটাও কদিন ধরে গড়বড় করছে, বেঁকে বেঁকে যায়।

ভাড়া করা বিয়েবাড়ির গেটে রোগা কনস্টেবলটা এখন টুলে বসে ঢুলছে। মালবিকার বিয়ের সেপাই! খুব সাঁটিয়েছে লোকটা, পাতে ফিশফ্রাই উপচে পড়ছিল, তন্নিষ্ঠা স্বচক্ষে দেখেছে। লোকটাকে টপকে ফুটপাথে এসে তন্নিষ্ঠা বড় করে একটা শ্বাস টানল। ওপরে আনন্দ হল্লা সবই মোহনীয়, তবে খোলা

হাওয়ার স্বাদই আলাদা। কী চমৎকার এক মলয় বইছে, আহা। নাহ্, এই মধুমাসেই বিয়ে করা সার্থক। মালবিকাটা জিতে গেল।

চারদিক সুনসান, সমস্ত দোকাপনাটের ঝাঁপ বন্ধ, লোকজন প্রায় চোখেই পড়ে না। গলিতে গোটা তিন চার টানারিকশা নিথর, চালকরা ধারেকাছে কেউ নেই। ফাঁকা রাস্তায় সিংহের মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা ক্ষয়াটে নেড়ি কুকুর। ফুটপাথবাসীরা ধার ঘেঁষে শয্যা পেতেছে, ডুবে গেছে গাঢ় নিদ্রায়। বড় রাস্তা দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ ছুটে যাচ্ছে গাড়ি। সামনের বৃত্তাকার পার্ক ঘিরে পর পর টিউবলাইট, বহমান রাজপথের ধারে শ্রেণীবদ্ধ হ্যালোজেন রোশনাই। আলোময় এই শহর কেমন যেন রহস্যময় এখন।

তন্নিষ্ঠা তেমন একটা গয়না পরেনি। গলায় সরু নেকলেস, কানে ঝুমকো, হাতে চওড়া বাউটি, ব্যস। তবু আঁচলটা ভাল করে জড়িয়ে নিল গায়ে, রাস্তা পার হয়ে ওপাশের এস টি ডি বুথে গেল।

শাটার অর্ধেক নামানো, ভেতরে এক মাঝবয়সী লোক টিফিন-কেরিয়ার খুলে যাচ্ছে। রুটি, আলু ভেণ্ডির সবজি, কাঁচা পেঁয়াজ।

তন্নিষ্ঠা গলা খাঁকারি দিল,—দাদা, একটা ফোন করা যাবে?

খেয়ে চলেছে লোকটা, চোখ তুলল না। বিরস স্বরে বলল,—সেই জন্যই তো খোলা আছে। লোকাল, না বাইরে?

—লোকাল।

অবহেলা ভরে কাউন্টারের ওপরে রাখা টেলিফোন এগিয়ে দিয়েছে লোকটা। তন্নিষ্ঠা ভেবেছিল বাবা ফোন ধরবে। অনেক রাত্রি অবধি জেগে থাকে বাবা। বইপড়ার নেশা। কিন্তু ওপারে মা।

তন্নিষ্ঠার কথা পুরো শোনার আগেই নন্দিতা কড়া গলায় বলল,— তুমি কিন্তু খুব ইরেসপনসিবল হয়ে যাচ্ছ তিন্নি। অনেক আগে তোমার ফোন করা উচিত ছিল।

—সরি মা। তন্নিষ্ঠা সামান্য কুঁকড়ে গেল,—অনেকক্ষণ ধরেই করব করব ভাবছি। কিছুতেই...হইচই-এর মাঝে বেরনো যায়!

—বুঝেছি। সব ভাল মতো চুকেছে?

—হ্যাঁ।

—ওখানে শোয়ার কোনও প্রবলেম হবে না?

—শোয়া হবেই না। এখনই বাসর শুরু হবে।

—ও। সকালে দেরি কোরো না। কাল আমি একটু তাড়াতাড়ি অফিস বেরোব, তার আগে দয়া করে চলে এসো।

মা আজ একটু গরম মনে হচ্ছে? বাবার সঙ্গে কিছু হল নাকি আবার?

তন্নিষ্ঠা কথা বাড়াল না। শুধু বলল,—আমি আটটার মধ্যে পৌঁছে যাব।

আহার পর্ব শেষ, লোকটা কাউন্টারের ওপারে মাদুর চাদর বিছিয়ে ফেলেছে, এবার শোবে বোধহয়। পয়সা মিটিয়ে বেরিয়ে এল তন্নিষ্ঠা।

হলঘরে ঢুকতে গিয়ে তন্নিষ্ঠা থমকাল একটু। বিশাল কক্ষে এখন মাত্র দুজন মানুষ। মালবিকার বাবা কেটারারের সঙ্গে বসে হিসেবনিকেশ করছেন। কী যেন বলছে কেটারার ভদ্রলোক, দুদিকে জোরে জোরে মাথা নাড়ছেন মালবিকার বাবা। মৃদু তর্কাতর্কি হচ্ছে যেন? অনুষ্ঠান চুকলেও কত যে ঝঞ্ঝাট থাকে!

তন্নিষ্ঠা সরে এল। বাসর জমজমাট, পর্ণা গান গাইছে খোলা গলায়। নজরুলগীতি। সই, ভাল করে বিনোদ বেণী বাঁধিয়া দে...। রীতিমতো রেওয়াজ করা গলা পর্ণার, চোখ বুজে শুনলে ফিরোজা বেগম বলে ভুল হয়। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে সকলে। শুধু প্রত্যুষ নামের ওই বকবক ষষ্ঠীটা ভুল তালে মাথা দুলিয়ে চলেছে। পারেও! জোকার। তুলনায় সুপ্রিয়র অন্য বন্ধুটা, অভিমন্যু না কী যেন নাম, অনেক পদের। সোবার। দেখতেও মন্দ নয়। চেহারা লম্বার দিকে, চওড়া কাঁধ, গালে সযত্নলালিত দাড়ি, চোখে হাইপাওয়ারের চশমা। বাদামি মুখমণ্ডলে একটা কাঠিন্যের ছাপ আছে। চোখ বুজে বসে আছে এখন, ভঙ্গিটি ধ্যানী সাধকের। কায়দা মেরে ঘুমোচ্ছে না তো?

পর্ণার গান শেষ, সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হাততালি। প্রত্যুষ মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করল,—মহাশয়ার নাম জানতে পারি?

—পর্ণা।

—কী?

—পর্ণা। আমি পর্ণা মুখার্জি।

—কী পর্ণা? ঋতু শ্রী সু মধু বিদ্যুৎ কিছু একটা তো আছে সঙ্গে?

—কিছু নেই। আমি শুধুই পর্ণা। আপত্তি আছে?

—বিন্দুমাত্র না। আমি পছন্দসই কিছু একটা জুড়ে নেব। প্রত্যুষ ফিচেল হাসল,—আমি কি মহাশয়ার কাছে আমার ক্যান্ডিডেচার পেশ করতে পারি?

মালবিকা খিলখিল হেসে উঠল, —ও অলরেডি বুকড্। ওর উড বি এখন ব্যাঙ্গালোরে। সামনের জুলাইতে আসছে, পক্ষীরাজে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে।

—ওফ্, হাফসোল্। কৃত্রিম বেদনায় বুকে হাত চাপল প্রত্যুষ। মালবিকার দিকে ফিরে বলল,—ঝোপে ঝাড়ে কুড়ুল চালিয়ে লাভ নেই। গোড়াতেই ক্লিয়ার করে দাও তোমার বন্ধুদের মধ্যে কে কে ফ্রি আছে।

—চিন্তায় ফেললেন। মালবিকার ভুরুতে নকল ভাঁজ, —কোয়েলকে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ওর সিগনাল পড়ে গেছে। ওর বর তথা বর্বর ওই শেখর, আপনার পাশেই বসে। সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে লটঘট, গত বছর পিঁড়িতে বসেছে।... আঁখি এখন গলাজলে, এক পেঁপে চোর থুড়ি প্রফেসার ওকে নাকানি চোবানি খাওয়াচ্ছে।... আর ওই যে দেখছেন পেছনে ঘাপটি মেরে বসে, তন্নিষ্ঠা, ওরও সব ঠিকঠাক। কী কারণে যেন তোদের বিয়েটা পিছিয়ে গেল রে তনু?

হট্টমেলায় নিজের প্রসঙ্গ এসে পড়ায় অস্বস্তি বোধ করল তন্নিষ্ঠা। তবু সপ্রতিভ ভাবেই বলল, —শৌনকের দাদু মারা গেছেন, তাই...। কালাশৌচ।

—দাদু মারা গেলে এসব হয় নাকি? দাদু তো অন্য গোত্র! সুপ্রিয় বিজ্ঞের মতো বলল।

—দাদু মানে বাবার বাবা। ঠাকুরদা।

—ও, তাই বলো। তা প্রায়শ্চিত্ত করে নিলেই তো হয়।

অনেকক্ষণ পর, এই প্রথম, অভিমন্যু কথা বলে উঠল,—কালাশৌচ টৌচ আজকাল আবার কেউ মানে নাকি?

শেখর লঘু গলায় বলল,—যে মানে, সে মানতেই পারে। একটু আধটু দেশি কাস্টম তো আমাদের মানাই উচিত।

—সিলি কাস্টম। অপ্রয়োজনীয় রীতিনীতি।

—কোনও রীতিনীতিই আকাশ থেকে পড়ে না, সব আমাদের জন্য তৈরি। সবেরই কিছু প্লাস পয়েন্ট আছে। শেখর তর্ক জুড়েছে,—পরিবারের একজন মারা গেছে, তাকে সম্মান জানাতে হবে না?

—সরি। মানতে পারলাম না। কালাশৌচ বলে কোন আমোদ প্রমোদটা আজকাল বন্ধ থাকে শুনি? বাড়িতে একটা বিয়ে হলে মৃত মানুষকে বুঝি অসম্মান করা হয়?

—এগজ্যাক্টলি। ঈপ্সিতা মাথা দোলাল,—সম্মান কামস্ ফ্রম হৃদয়। সোশাল ফাংশান স্টপ করে দেওয়াটা বোগাস ব্যাপার।

—আচ্ছা, কালাশৌচ চলতে চলতে যদি আর একজন মারা যায়, তনুর বিয়ে আবার এক বছর পিছোবে? আঁখি চোখ টিপল, —এই করতে করতে দেখা যাবে তনুর বিয়েটাই হয়তো আর হল না?

—আমার কী মনে হয় জানেন? অভিমন্যু গলা ঝাড়ল, —ওই সব বস্তাপচা নিয়মকানুনগুলো টান মেরে নর্দমায় ফেলে দেওয়া উচিত। যত্ত সব প্রাগৈতিহাসিক রিচুয়াল।

শেখর হাত ওল্টালো, —সেভাবে ধরতে গেলে তো মন্ত্র পড়ে বিয়েরও কোনও মানে হয় না।

—হয় না-ই তো। যে লোকটা আওড়ায় সেও অর্থ বোঝে না, যারা শোনে তারাও না। মন্ত্রগুলো আমাদের কাছে অং বং চং ছাড়া আর কী? এই যে সুপ্রিয় এতক্ষণ নিষ্ঠাভরে মুখ ব্যথা করল, ওকে জিজ্ঞেস করুন ও কটা শব্দের মানে জানে?

মালবিকা মিনমিন করে বলল, —তবু শাস্ত্রে যা আছে, তা তো একটু আধটু পালন করতেই হবে।

—শাস্ত্র? হোয়াট ইজ শাস্ত্র? আজ থেকে হাজার দুহাজার বছর আগের মানুষজন নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি মতো যে সব নিয়ম বিধান তৈরি করে গেছে, তাকে অন্ধ ভাবে অনুসরণ করার নাম শাস্ত্রপালন? সময় কি এগোয়নি? মানুষ কি এখনও ঠুলি পরে থাকবে? খতিয়ে দেখবে না ওগুলোর এখন আর কোনও ইউটিলিটি আছে কি না? অভিমন্যু হঠাৎই বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, —ওই

শাস্ত্রই আমাদের মাথা খেল। শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে এমন কতকগুলো জোলো সংস্কাব এখনও অনড় হয়ে বাসা বেঁধে আছে! সাধে কি আজকাল ধর্মব্যবসায়ীদের এত রমরমা?

—ও, আপনি এথিষ্ট! শেখরের ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি।

—আমি কী, সেটা অন্য প্রশ্ন। কিন্তু শাস্ত্র ধর্ম, এগুলো কী সে তো আমাদের জানা দরকার। যত্ত সব মানুষকে সুড়সুড়ি দেওয়াব চাবিকাঠি!

প্রত্যুষ এতক্ষণ পেন্ডুলামের মতো এদিক ওদিক ঘাড় দোলাচ্ছিল। হঠাৎ কটমট করে অভিমন্যুর দিকে তাকিয়েছে, —অ্যাই অভি, এটা তোর বিজ্ঞান মঞ্চ নয়। অনেক হয়েছে, আর নো জ্ঞান মারা। বলেই নাটুকে ভঙ্গিতে মালবিকার দিকে ফিরেছে,—কীসের থেকে কী হইল, মোহন পলাইয়া গেল! লেকচারের গুঁতোয় আমার কেসটাই ভোগে?

পায়রা ওড়ানো হাসি উঠল আবার। পলকে বাসর স্বাভাবিক ছন্দে। মালবিকা স্মিত মুখে বলল, —না স্যার, ভুলিনি।... তন্নিষ্ঠা তো ফস্‌কে গেল। হাতে পড়ে রইল পেন্‌সিল। মানে ঈপ্সিতা।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঈপ্সিতা খালি আছে।

—ওরেব্বাস, আমি বাংরেজি বলতে পারব না।

ঈপ্সিতা মুখ বেঁকাল, —আমার বয়েই গেছে।

—বাহ্, এই তো বেশ বাংলা বলে!

—আই ক্যান স্পিক বাংলা বেটার দ্যান ইউ। বলি না, আই ডোন্ট ফিল লাইক, তাই।

—আহা রে, আমার বাংলা মায়ের অ্যাংলো মেয়ে!

চোখে আগুন হেনে ঈপ্সিতা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কোয়েল প্রায় মুখ চেপে থামাল তাকে। মোটাসোটা গোলগাল চেহারার ঈপ্সিতা ধনীর দুলালী, বাবার নাকি তিনটে টিগার্ডেন, বাড়িতে তাদের নিখুঁত বিলিতি ঠাটবাট। তবে মুখের ভাষা যেমনই হোক, মনটা তার ভারী সাদামাঠা। ইউনিভার্সিটি গিয়ে সে দিব্যি এসব মধ্যবিত্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে, খুচরো ঠাট্টা-তামাশা উপেক্ষা করেই। এমন আনন্দের মুহূর্তে সে চটেমটে একটা সিন ক্রিয়েট করুক, কোনও বন্ধুরই তা অভিপ্রেত নয়।

আবার হাসিমস্করা চালু। ক্ষণপূর্বের মিতভাষী রাগী যুবক অভিমন্যুও এবার টুকটাক ফুট কাটছে। তাঁরই ফাঁকে ফাঁকে চলছে মালবিকা আর সুপ্রিয়র চোরা শুকসারি-সংলাপ। দুটিতে বেশ ভাব হয়ে গেছে। মালবিকার চন্দনশোভিত মুখে গভীর তৃপ্তির ছাপ। দেখে ভাল লাগছিল তন্নিষ্ঠার। সম্বন্ধ করে বিয়ে, মালবিকা মনে হয় সুখীই হবে।

পুরনো কথা উঁকি দিয়ে গেল তন্নিষ্ঠার মনে। বড়সড় একটা ল্যাং খেয়েছিল মালবিকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়। অনিন্দ্য বজ্জাতটার সঙ্গে বেশ একটা মাখো মাখো ব্যাপার ঘটেছিল মালবিকার। ক্যান্টিন কফিহাউস গঙ্গার পাড়

সিনেমা হল নন্দনচত্বর, সর্বত্রই মালবিকা আর অনিন্দ্য। বলা নেই কওয়া নেই, অনিন্দ্য দুম করে কেটে পড়ল অস্ট্রেলিয়ায়। মাঝে এক দু-বার এসেছিল, মালবিকার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। কিছু নিশ্চয়ই হয়েছিল, মালবিকা মুখ ফুটে বলে না। মাঝে কেমন যেন বিষাদপ্রতিমা হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। সুপ্রিয় নিশ্চয়ই মালবিকার মন থেকে অনিন্দ্যকে মুছে দিতে পারবে।

পর্ণা আবার গান ধরেছে। সমবেত দাবিতে হিন্দি। ফিল্মি গান, তবে ছন্দটি ভারী সুরেলা। আলাপচারিতাও চলছে, নিচু পর্দায়। শেখর এম এ করার পর প্রাইভেটে ম্যানেজমেন্টের কোর্স করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে সফ্‌টওয়্যার ট্রেনিংও, চাকরি পেয়েছে নামী ফিনান্স কোম্পানিতে। অফিস তার ধ্যানজ্ঞান, এই বাসরেও সে অফিসের সমস্যা সাতকাহন করে শোনাচ্ছে সুপ্রিয়কে। বুঝদারের মতো মাথা নাড়ছে সুপ্রিয়, বোধহয় পরামর্শও দিচ্ছে। কোয়েল সম্প্রতি ঢুকেছে এক কুরিয়ার সার্ভিসে, ফিসফিস করে আঁখিকে স্যালারির অঙ্ক শোনাল, তেমন একটা বিশাল কিছু নয়, তবু মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল আঁখির। স্বাভাবিক। আঁখি অনেক বেটার স্টুডেন্ট ছিল, এখন বেহালার দিকে এক কলেজের পার্টটাইম লেকচারার। হাতে যা পায় শুনলে ঠিকে ঝিরাও হাসবে।

তন্নিষ্ঠার ছোট্ট শ্বাস পড়ল। তার তাই বা জুটছে কই! এম এ হল, বি এড হল, তবু...। গতবার নেট স্লেট দুটোতেই বসেছিল, কোয়ালিফাই করতে পারেনি। এ বছর যদি লেগে যায়...!

রাত বাড়ছে। এবার শুরু হয়েছে ঝিমুনির পালা। উচ্ছ্বাস অনেক কমে এসেছে ঘরে, প্রত্যূষ পর্যন্ত হেলান দিয়েছে তাকিয়ায়, বেশ বোঝা যায় জোর করে চোখ খুলে রেখেছে। মালবিকার ঘাড় হেলে গেছে সুপ্রিয়র কাঁধে। ঈপ্সিতা চোখ কচলাচ্ছে, ঘড়ি দেখছে ঘন ঘন। শেখর আর অভিমন্যুই শুধু জাগ্রত। হাত পা নেড়ে কথা বলছে কুটুর কুটুর। ওই সব ধর্ম আর শাস্ত্র নিয়ে গম্ভীর আলোচনা বোধহয়। আঁখি আর কোয়েল গুটিসুটি মেরে শুয়েই পড়ল।

তন্নিষ্ঠারও চোখ লেগে আসছিল। ঘুম তাড়াতে উঠে গেল হল পেরিয়ে ব্যালকনিতে। বড় বড় হাই তুলল কয়েকটা, আড়মোড়া ভাঙল। বিয়েবাড়িতে এই সময়টাই খুব বিশ্রী। এই বাড়িতে আরও একটা ঘর আছে, সেখানে আত্মীয়স্বজনরা ঠাসাঠাসি করে শুয়েছে। কোথায় যে এখন যায় তন্নিষ্ঠা! ধুৎ, বাড়ি ফিরে গেলেই হত।

বাসর থেকে বেরিয়ে এসেছে ঈপ্সিতা। সঙ্গে কোয়েল শেখর। ঈপ্সিতা চেঁচিয়ে ডাকল, —এই তনু, উই আর লিভিং ইয়ার।

—এত রাতে?

—বাড়িতে বলে রেখেছি, লেটনাইটেও ফিরতে পারি। শেখরদের ড্রপ করে দেব। ইফ ইউ লাইক আই ক্যান ড্রপ ইউ অলসো অ্যাট ইওর বাড়ি।

লোভনীয় প্রস্তাব। কিন্তু না, ঝঞ্ঝাট অনেক। তাদের ফ্ল্যাটবাড়ির কম্পাউন্ডের গেটে তালা পড়ে গেছে, দারোয়ানকে জাগাতে জান নিকলে যাবে। তারপর

আবার বাড়ি গিয়ে বেল বাজাও, ঘুম থেকে তোলো...।

তন্নিষ্ঠা মাথা ঝাঁকাল,—না রে, আমি পর্ণা আঁখিদের সঙ্গে ম্যানেজ করে নিচ্ছি। সকাল হলেই বেরিয়ে পড়ব।

শেখর কোয়েল হাত নাড়ল,—কাল আসছিস তুই? বাসি বিয়েতে?

—দেখি।

—আমাদের তো হচ্ছে না।....পরশু তাহলে দেখা হবে। বাই।

ঈঙ্গিতাদের পদশব্দ মিলিয়ে যেতেই পায়ে পায়ে হলঘরের সোফায় এল তন্নিষ্ঠা। পাখার হাওয়ার ঠাণ্ডা লাগছে অল্প অল্প, শাড়িটা ভাল করে সাপটে নিল গায়ে। পা ওঠাল সোফায়, হাঁটুতে মুখ গুঁজেছে।

সবে ঘোর মতো এসেছে, দেশলাই জ্বালানোর আওয়াজ! তন্নিষ্ঠা চমকে তাকাল। অভিমন্যু। সিগারেট ধরাচ্ছে। পোড়া কাঠি কোথায় ফেলবে ভেবে পাচ্ছে না, পকেটে পুরে ফেলল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তন্নিষ্ঠার চোখে চোখ পড়েছে অভিমন্যুর। অপ্রস্তুত মুখে হাসল—এখানে কেন? ঘরে গিয়ে শোও না।

বেশ পাকা আছে তো ছেলেটা! সামান্য চেনাতেই অবলীলায় তুমি তুমি!

তন্নিষ্ঠাও ইচ্ছে করে তুমি বলল,—ওটা তোমাদের ঘর। গেস্ট রুম। আমি এখানেই ভাল আছি।

—তোমার বন্ধুরা কিন্তু ওখানেই লুটিয়ে পড়েছে।

—ওরা পারে। অপরিচিত লোকের মাঝখানে আমার ঘুম হয় না।

অভিমন্যু কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসল,—আমারও সেম কেস। আমিও তো ওই জন্যে....

হলঘরে আরও বেশ কয়েকটা ফাঁকা সোফা। সেদিকে ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে তাকাল তন্নিষ্ঠা। বুঝিবা বলতে চাইল, আমি কিছু মনে করব না, তুমি স্বচ্ছন্দে কোথাও একটা বডি ফেলতে পার।

ইশারা-টিশারা বোঝার ধার দিয়েই গেল না অভিমন্যু। সামনে এগিয়ে এসেছে,—প্রত্যুষটা আজ খুব জ্বালাল তোমাদের, তাই না?

—একটুও না। তন্নিষ্ঠা পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসল,—ওরকম কেউ না থাকলে বিয়েবাড়ি জমেই না।

—হ্যাঁ, ও একটু ফানি আছে।

—ভাল তো। হুঁকোমুখো হ্যাংলা নয়।

অভিমন্যু যেন কথাটা ঠিক সহজভাবে নিতে পারল না। কাঁচুমাচু মুখে বলল,—কেন, আমিও তো হাসি।

—আমি তো তোমাকে মিন করিনি। ইন জেনারেল বলছি।

—ও, তাই বলো। আমি ভাবলাম....। কয়েক সেকেন্ড কী যেন চিন্তা করল অভিমন্যু। তারপর বলল,—তখন কালাশৌচের এগেনস্টে বললাম বলে তুমি কিছু মাইন্ড করোনি তো? আসলে আমি বলতে চাইছিলাম আমরা মুখেই

আধুনিক, এদিকে মনে মনে পড়ে আছি সেই মান্ধাতার আমলে। শিক্ষিত লোকের এরকম ডুয়েল চেহারা আমার সহ্য হয় না।

সহ্য তো তন্নিষ্ঠারও হয় না। কিন্তু উপায় কী? শৌনকের বাবা সব রকম আচার বিচার মানেন যে। এই করলে অযাত্রা, ওই দেখলে বাধা, অমুক মাসে তমুক জিনিস ছুঁতে নেই....। নিজে ডাক্তার তো, সঙ্গে সঙ্গে একটা করে বৈজ্ঞানিক যুক্তিও খাড়া করে দেন। তন্নিষ্ঠার আশীর্বাদের দিন কী হল? পাত্রপক্ষের আসার কথা বিকেলে, ভরদুপুরে ভদ্রলোক সদলবলে হাজির। কেন? না, একটা বিয়াল্লিশের পরে নাকি আর শুভ কাজে বেরনোর যোগ নেই! শৌনকের দাদু মারা যাওয়ার পর বাবা গিয়েছিল। ফিরে এসে সে কী হাসাহাসি! মৃতের জন্য শোক নেই এতটুকু, শৌনকের বাবা নাকি খালি হম্বিতম্বিই করে চলেছেন! ডেডবডির মাথার তলায় আগে গীতা দাও, পশ্চিমে মাথা করে শুইয়ো না....! ভদ্রলোক নাকি পূজা আহ্নিক না করে চেম্বারে বসেন না, ফি শনিবার কালীবাড়ি ছোটেন। শৌনক আবার গর্ব করে বলে, আমার পিতৃদেব ডাক্তার সুকুমাব রায়চৌধুরী কিন্তু অত্যন্ত গোঁড়া মানুষ, তুমি তার সঙ্গে ঠিকমতো মানিয়ে চলতে পারবে তো!

তন্নিষ্ঠা অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলল,—কী করা যাবে, আমাদের বেশিরভাগ মানুষ তো এ রকমই।

—তুমিও কি বেশির ভাগেরই দলে?

—ভেবে দেখিনি। তন্নিষ্ঠা হেসে ফেলল,—দাঁড়িয়ে আছ কেন, বোসো।

বসল অভিমন্যু। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে আবার এদিক ওদিকে তাকাচ্ছে।

তন্নিষ্ঠা বলল,—পকেটে রেখে দাও। তবে স্বচ্ছন্দে মেঝেতেও ফেলতে পার, গোটা ঘরটাই অ্যাশট্রে হয়ে আছে।

অভিমন্যু হেসে ফেলল। মেঝেয় ফেলে চেপে চেপে নেভাচ্ছে সিগারেটটা। জোরে শ্বাস নিল একটা, আরও কয়েকটা পর পর। নাক কুঁচকে শোঁকার ভঙ্গি করছে,—তোমার পারফিউমের গন্ধটা তো দারুণ! অনেকটা ব্রুট ঘেঁষা।...কিন্তু এ তো ব্রুট নয়!

তন্নিষ্ঠা টেরচা চোখে তাকাল,—তুমি মনে হচ্ছে গন্ধবিশারদ? পারফিউমের শখ আছে বুঝি?

—নাহ্, ওই পেশার খাতিরে যেটুকু....

—পারফিউম ব্যাচো?

—বেচি তো বটেই। অভিমন্যু চোখ ছোট করে মুখ টিপে হাসছে। ভঙ্গিটি বিচিত্র। বলল,—অল্পস্বল্প বানাইও।

ঈষৎ চমকাল তন্নিষ্ঠা,—তোমার পারফিউমের ফ্যাক্টরি আছে?

—হ্যাঁ, তাও বলতে পার। যেন বাচ্চা মেয়েকে বোঝাচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে কথা বলছে ছেলেটা,—কারখানা একটা আছে। বারো বাই বারো একটা ঘর, তিনজন কর্মচারী, দুটো মেশিন....

—চলে তোমার পারফিউম? মার্কেটে দেখেছি?

—সম্ভবত না। তোমরা তো সব ফরেন পারফিউম মাখো, আমার দিশি ব্যাপার। বাজার বলতে মফস্সল। অভিমন্যু আবার নাক টানল,—তোমার গন্ধটা বেশ লাগছে। ভাবছি চুরি করব।

—গন্ধ চুরি?

—মামলা করতে পারবে না। কী নাম তোমার পারফিউমটার?

—কী জানি, অত দেখিনি। মার ড্রয়ারে ছিল, মেখে নিয়েছি।.... তোমার সত্যিই ভাল লাগছে? বিদেশি ফুলের গন্ধ, তাই না?

—উহুঁ, এটা ফ্লোরাল নয়। পারফিউমের অনেক টাইপ আছে। যেমন ধরো....। একটা দীর্ঘ লেকচার শুরু করতে যাচ্ছিল অভিমন্যু, থেমে গেল অকস্মাৎ। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,—যাকগে, তুমি তো পরশু বউভাতে আসছই, নামটা কাইন্ডলি দেখে এসো। তোমার গন্ধটা আমায় খুব হন্ট্ করছে।

বিটকেল ছেলে তো! বাক্যটা প্রায় বেরিয়েই আসছিল তন্নিষ্ঠার মুখ থেকে, হঠাৎ ঝুপ করে লোডশেডিং। আলোকিত হলঘর নিমেষে মিশমিশে কালো।

কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, পাশের ছেলেটাকেও না।

কটা মাত্র সেকেন্ড গেছে, মনে হচ্ছে অনন্ত সময়। একটু একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল তন্নিষ্ঠা। দু ফুট দূরের সদ্য চেনা পুরুষ যদি ঝপ করে অদৃশ্য হয়ে যায়, কেমন লাগে? বিয়েবাড়ি হিসেবে যখন ভাড়া দেয়, নিশ্চয়ই এখানে জেনারেটর আছে! চালাচ্ছে না কেন! দারোয়ান নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে? এ ঘর ও ঘরে কেউ জাগছেও না তো! উঠে যাবে তন্নিষ্ঠা? বিশ্রী দেখায়। ছেলেটা নির্ঘাৎ ভাববে তন্নিষ্ঠা তাকে বাঘ ভাল্লুক ঠাউরেছে। ছেলেটা তার দিকে প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে নেই তো? কিন্তু ওই বা দেখবে কী করে! যাক, নিশ্চিন্ত। আজ কি অমাবস্যা? বাইরেও একফোঁটা আলো নেই কেন? অমাবস্যায় কি বিয়ে হয়?

ভাবনাটুকু যেন পড়ে ফেলেছে অভিমন্যু, ফস করে দেশলাই জ্বালাল। পকেট থেকে সিগারেট বার করতে গিয়েও করল না, জ্বলন্ত কাঠি হাতেই ধরে আছে। নিবে গেল কাঠি, আবার একটা ধরাল। আবার নিবল, আবার জ্বালিয়েছে।

আধো আলোয় তাকে দ্যাখে নাকি অভিমন্যু?

আরও একটা কাঠি নেভার পর তন্নিষ্ঠা বলে উঠল,—থাক না, কাঠি নষ্ট করছ কেন?

আবার অন্ধকার। আবার নৈঃশব্দ্য। আবার চোরা অস্বস্তি।

অভিমন্যুই বরফ ভাঙল। যেন কথা বলার জন্যই কথা বলছে, যেন কথা খুঁজে নিয়ে কথা বলছে, এমন স্বরে বলল,—কোন মাসে তোমার বিয়ের ঠিক হয়েছিল?

—এই তো, অঘ্রানে।

—মানে নেক্সট অঘ্রান অবধি তোমায় প্রতীক্ষা করতে হবে?

—অগত্যা।

— তোমার বরের নামটা কিন্তু বেশ। শৌনক কে ছিল জানো?

একবার শুনেই শৌনক নামটা মনে রেখেছে তো!

তন্নিষ্ঠা আলগাভাবে বলল,—হবে কোনও দেবতা। বা অসুর।

অভিমন্যু গমগম হেসে উঠল,—আরে না না, রামায়ণের ক্যারেক্টার। মানুষ। জনকের ছেলে। ধরতে গেলে সীতার ভাই, রামের শালা। বলা হয়, শৌনকই নাকি গোত্র ধর্মের প্রবর্তনকারী ঋষি।

ফান্ডা লড়াচ্ছে! অন্ধকারে মুখ টিপে হাসল তন্নিষ্ঠা। কত ভাবেই যে ছেলেরা মেয়েদের ইম্প্রেস্ করার চেষ্টা করে!

অভিমন্যু ফের বলল,—শৌনকবাবু করেন কী?

—ইঞ্জিনিয়ার। জেফার্সানে আছে।

—সে তো বিশাল কোম্পানি! হেড অফিস কি কলকাতায়?

—না, নয়ডাতে। দিল্লি।

ভটভট শব্দ বেজে উঠেছে। আলোগুলো জ্বলে উঠল। অজান্তেই একটা স্বস্তিমাখা শ্বাস বেরিয়ে এল তন্নিষ্ঠার বুক থেকে। এদিক ওদিক তাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে,—যাই, ওরা জেগেছে কি না দেখি।

নাহ্, সারাদিনের হুল্লোড়ের পর সকলেই শ্রান্ত, কয়েক মিনিটের বিদ্যুৎহীনতায় কারুরই চোখ খোলেনি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে আছে আঁখি-রা, প্রত্যুষের মুখ হাঁ, মালবিকা সুপ্রিয়র মাথা এক তাকিয়ায়।

অভিমন্যুর ভ্যাজর ভ্যাজরে ঘুম ছিঁড়ে গেছে। পর্ণার পাশে একটুক্ষণ শুয়েও উঠে পড়ল তন্নিষ্ঠা। সে একটু শয্যাবিলাসী, নিজের বিছানা ছাড়া ঘুম তার আসবেই না।

অভিমন্যু ব্যালকনিতে। একটা চেয়ারে বসেছে, অন্য চেয়ারে পা, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট, মাথা খাটো রেলিঙে হেলানো।

হাল্কা মেজাজে অভিমন্যুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল তন্নিষ্ঠা। এখনও কারেন্ট আসেনি, পথবাতিগুলো এখনও নিবে আছে, বাইরে ছমছম অন্ধকার।

তন্নিষ্ঠা কৌতুকের স্বরে বলল,—এত সিগারেট খাচ্ছ কেন? ঘুম তাড়াচ্ছ?

আলগা একবার তন্নিষ্ঠাকে দেখে নিয়েই অভিমন্যুর চোখ আবার বাইরে। দূরমনস্কের মতো বলল,—রাস্তাটাকে খুব স্ট্রেঞ্জ লাগছে, তাই না?

—তাই কি? তন্নিষ্ঠা রেলিঙ ধরে ঝুঁকল।

—মনে হচ্ছে না ওটা একটা নদী? পিচডার্ক! বয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে?

তন্নিষ্ঠার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। গন্ধবিদ কি কবিতাও লেখে!

দুই

বেশ কয়েক মাস ধরেই আশঙ্কাটা ঘনীভূত হচ্ছিল, চরমপত্র মিলল আজ। অফিস ছুটির মিনিট কুড়ি আগে। মুম্বই-এর সদর দপ্তর থেকে পাঠানো সাদা জানলা-খামগুলো টেবিলে টেবিলে বিলি করে গেল লক্ষ্মণ।

খাম খোলার সময়েও শুভেন্দু পুরোপুরি আন্দাজ করতে পারেনি। পড়তে পড়তে শরীর শক্ত হয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। চোস্ত বয়ান, ধানাই পানাই নেই, যা বলতে চায় চাঁছাছোলা ভাষায় চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছে কোম্পানি। ...পূর্বাঞ্চলে ক্রমাগত লোকসানের দরুন এবং এদিকে আর ব্যবসা বাড়ার আশু সম্ভাবনা না থাকায় কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী কয়েকটি জরুরি পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হচ্ছে। এক, কলকাতাস্থিত পূর্বাঞ্চলীয় দপ্তরটি আর পূর্বাবস্থায় থাকবে না, এখানকার কর্মিসংখ্যা আটত্রিশ থেকে বারোয় নামিয়ে আনা হল। দুই, যে সব কর্মচারীর বয়স পঞ্চাশের উপরে, অথবা যাঁরা কুড়ি বছরের বেশি চাকরি করছেন কোম্পানি তাঁদের আগামী নব্বই দিনের মধ্যে স্বেচ্ছা অবসর নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছে। কোম্পানিতে তাঁদের দীর্ঘ অবদানের কথা মাথায় রেখে এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্র্যাচুয়িটি ও অন্যান্য আইন মোতাবেক সুবিধা ছাড়াও এককালীন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য কোম্পানি অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে। অর্থের পরিমাণ কী ভাবে স্থির হবে, পত্রের শেষে তার উল্লেখ করা আছে। তিন, যাঁদের বয়স পঞ্চাশের নীচে, অথবা যাঁরা কুড়ি বছরের কম চাকরি করছেন, এমন দশ জনকে পূর্বাঞ্চলীয় শাখাতেই রাখা হবে। এই দশজন নির্বাচিত হবেন চাকরিজীবনে সিনিয়রিটি এবং কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে। চার, পিয়ন ব্যতীত এই শাখার বাকি কর্মচারীদের মুম্বই সদর দপ্তর এবং হায়দ্রাবাদ শাখায় বদলি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কে কোথায় যোগ দিতে ইচ্ছুক তা পনেরো দিনের মধ্যে মুম্বই সদর দপ্তরে জানানো আবশ্যিক। পাঁচ, পূর্বাঞ্চলীয় দপ্তরের শাখা-প্রধানকে আপাতত ওই দপ্তরেই কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

এর পর দু লাইনের শুকনো ভদ্রতা... উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির জন্য কোনও কর্মচারীর যদি অসুবিধা ঘটে, কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী তার জন্য আন্তরিক দুঃখিত। প্লিজ বেয়ার উইথ আস।

শেষ বাক্যটাকে মনে মনে অনুবাদ করতে পারল না শুভেন্দু। আমাদের মতো করে কষ্ট সহ্য করুন? আমাদের সঙ্গে কষ্ট সহ্য করুন? নাকি আমাদের সহ্য করুন? উঁহু, কোনওটাই হচ্ছে না। একমাত্র বুঝি সাহেবরাই শব্দগুলোর মর্ম বোঝে। অথবা দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা। ক্ষমতা হাতে থাকলেই বুঝি কথাগুলো বলা যায়।

রিডিং গ্লাস খুলে কপালের রগ টিপে ধরল শুভেন্দু, বসে আছে নিঝুম। মাথা বেবাক ফাঁকা, যেন মহাশূন্য। শেষ পর্যন্ত ছুটি তাহলে হয়েই গেল? মাত্র তিপ্পান্ন

বছর বয়সেই শুভেন্দু দাশগুপ্ত একজন অবসরপ্রাপ্ত নাগরিক! একজন মিস্টার এক্স! পুরো অফিস নিস্তব্ধ, আলপিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। তড়িৎ শ্যামল দীপঙ্কররা এই একটু আগেও আগামী কালের ক্রিকেট ম্যাচ নিয়ে গলা ফাটাচ্ছিল, তারা সহসা নির্বাক। বিহ্বল। অফিসের একমাত্র মেয়েটি, শমিতা পাইন, টাইপ মেসিনে হাত রেখে স্ট্যাচু। পিল্লাই আর সদাশিব ব্যানার্জিরও চোখ নিষ্পলক। হঠাৎ দেখলে মনে হয় গোটা অফিসটাই একটা ফ্রিজ শট।

মিনিট দশেক পর গুঞ্জন উঠল। সদাশিব অনুচ্চ স্বরে কী যেন বলল বিজন রায়কে, বিজন আরও নিচু গলায় অশ্লীল একটা খিস্তি করল।

তড়িৎ ফুঁসে উঠল,—মামদোবাজি পায়া? হুকুম করলেই মুম্বই হায়দ্রাবাদ ছুটতে হবে? কেস ঠুকে দেব আমি।

শ্যামল নীরস স্বরে বলল,—লড়ার পয়সা আসবে কোত্থেকে? চাকরিই তো থাকবে না।

—চাকরি খাওয়া অত সোজা? এই চিঠিটাকেই আমি বেআইনি প্রমাণ করব।

—করিস'খন। এখন আগে ভাব, কোথায় যাওয়ার অপশন পাঠাবি।

দীপঙ্কর মলিন হাসছে,—উত্তেজিত হয়ে লাভ কী? এ তো জানাই ছিল সাম ডে অর আদার...

শুভেন্দু মাথা ঝাঁকাল আপনমনে। সাম ডে অর আদার এবং দা ভেরি ডে, দুটোর মধ্যে গভীর পার্থক্য আছে, এ কথা কি বোঝে না দীপঙ্কর? বিপদের সম্ভাবনা আর বিপদ কি এক হল?

মণিশঙ্কর পিল্লাই টেবিল থেকে উঠে পড়েছে। কেমন যেন টলতে টলতে টয়লেটের দিকে চলে গেল। মিনিট খানেকেব মধ্যেই ফিরেছে, চোখে মুখে জল ছিটিয়ে। সিট অবধি গেল না, শুভেন্দুর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভাঙাচোরা হাসি খেলছে মুখে। রুমালে হাসি আর জল মুছতে মুছতে বলল,—সো দাশগুপ্তা, আওয়ার গেম ইজ ওভার!

শুভেন্দু কেঠো হাসল,—ও শিওর। একদিন না একদিন খেলা তো শেষ হতই। দু দিন আগে, নয় দু দিন পরে...

—নো নো, নট দু দিন। আরও নো বছোর আমার চাকরি ছিল। সার্ভিস আমায় বাই করে দিল।

—বাই বলছ কেন? উই ক্যান স্টার্ট অ্যাফ্রেশ। শুভেন্দুর স্বরে ঠিক প্রত্যয় ফুটল না, তবু বলল, —এখনও তো আমরা খাটতে পারি, কী বলো?

—কোথায় খাটব?

—হ্যাভ অ্যানাদার জব। তুমি পেয়ে যাবে, তোমার যা অ্যাকাউন্টসে ব্রেন আছে...

—বোগাস। হিউম্যান ব্রেন এখন টৌটালি ইন্‌এফেক্টিভ, কস্টিং-এ আসে না। কম্পিউটারে ডাটা ফিড করলে সে আমাদের চেয়ে অনেক ভাল অ্যাকাউন্টস করে দেবে। ... আর লোক নিলেই বা আমার চান্স কোথায়? থাউজেন্ডস অ্যান্ড

থাউজেন্ডস অব ছেলে বেকার...। আমার ছেলে তো বি কম করে সিম্পলি লয়টারিং, সেদিন একটা ইন্টারভিউ দিয়ে এল, ওনলি ফোরটিন হানড্রেড অফার করেছে। কম্পিউটার ট্রেনিং আছে, তাও। পিল্লাইয়ের ছোটখাটো চেহারাটা গুটিয়ে গেছে যেন। জোরে জোরে মাথা দোলাচ্ছে,—ক্যালকাটা এখন টোটালি ড্রাই। নাথিং ইজ লেফট্ ইন ক্যালকাটা, এক্সক্লুডিং দা লেফটস।

এত উদ্বেগের মধ্যেও শুভেন্দু হেসে ফেলল, —ওয়েল সেড। তোমার তো তা হলে কোট্টায়ামে পালিয়েও লাভ নেই, লেফট্ তোমার পিছু ছাড়বে না।

—কোট্টায়ামে যাব কেন? লাস্ট থারটিফোর ইয়ারস আমি ক্যালকাটায় আছি, ইটস্ মাই হোম নাউ। এখন কেরালায় নিজেকে ফিটই করতে পারব না। মোরওভার, ওখানেও তো আমি একজন ফিফ্‌টি প্লাস ম্যান....। সামনের চেয়ারে বসে পড়ল পিল্লাই, হাই মাইনাস পাওয়ার চশমার আড়ালে অক্ষিগোলক কেমন অস্বচ্ছ লাগে। বড় একটা শ্বাস ফেলে বলল,—বিলিভ মি, গোল্ডেন হ্যান্ডশেক হবে বুঝেছিলাম, কিন্তু...

—গোল্ডেন নয় গোল্ডেন নয়, আয়রন। সদাশিব পাশের টেবিল থেকে কথা শুনছিল, বলে উঠল,—দেওয়া থোওয়াগুলো স্টাডি করে দেখেছেন? তিন লাখের বেশি কমপেনসেশান জুটবে না।

—দ্যাট মিনস্, পিএফ টিএফ নিয়ে অ্যারাউন্ড...

—আমার একটি মেয়ের বিয়ে দিতে দু লাখের ওপর গেছে। সদাশিবের গলা নিমতেতো, এখনও দুটো বাকি।

শুভেন্দু বলে ফেলল,—এ খরচা অবশ্য আপনার চাকরি থাকলেও ছিল ব্যানার্জি!

—দুটো কি এক? সার্ভিস থাকলে লোন করা সহজ, সেই লোনের একটা ক্রেডিবিলিটি থাকে, সিকিউরিটি থাকে.... এখন আমায় কে ধার দেবে?

শুভেন্দু মনে মনে বলল, লাইন দিয়ে মেয়ে পয়দা করার সময় এগুলো ভাবা উচিত ছিল। মুখে বলল,—মেয়ের বিয়ে বিয়ে করে উতলা হয়ে লাভ নেই ব্যানার্জি। কষ্ট করে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, ওরা চাকরি বাকরি করবে, নিজেদের ম্যাচ নিজেরা খুঁজে নেবে।

—আপনার পক্ষে এসব বলে দেওয়া সোজা দাশগুপ্ত। নিজের মেয়ের একটি সলিড পাত্র ঠিক করে ফেলেছেন, মিসেস চাকরি করে... মোটা কামাই.... মিসেসের লোনে ফ্ল্যাট হয়ে গেল, ওয়েলসেটলড্ লাইফ...। দিব্যি পায়ের ওপর পা ছড়িয়ে থাকবেন, নাটক থিয়েটার করে বেড়াবেন...। একা সংসারের জাঁতা পেষা যে কী জিনিস, তা তো কোনওদিন টের পেলেন না!

কথাগুলো বর্ণে বর্ণে সত্যি। আবার সত্যি নয়ও। স্ত্রীর যদি স্বামীর চেয়ে রোজগার বেশি হয়, আর সেই স্ত্রী যদি নন্দিতার মতো দাপুটে হয়, তাহলে স্বামীকে সারাজীবন কী পিষতে হয়, তা শুধু শুভেন্দুই জানে। নিজের ভেতরটা কি সে কখনও উপড়ে দেখাতে পেরেছে কাউকে? এ এক অসহ্য ক্ষরণ। রক্তহীন,

কিন্তু সর্বক্ষণ রক্তাক্ত হয়ে থাকে হৃদয়।

সামনে দিয়ে স্টোরের সুকমল ঘোষ আর অনিল সাহা যাচ্ছে। কেজো পায়ে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের ঘরে ঢুকল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাদের দেখল পিল্লাই। মুখ বিকৃত করে বলল,—শালারা ধার দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর দু তিনটে বছর বেশি হলেই...

সদাশিব বলল,—ঘোষের অনেক বয়স কমানো আছে। আমি জানি। ওর হায়ার সেকেন্ডারির সার্টিফিকেটটা দেখেছেন? সাড়ে চোদ্দোয় নাকি পাশ করেছে! ... আমার বাপটাই শালা গান্ডু ছিল।

—শালারা এখন খুব তেল মারবে মজুমদারকে।

—লাভ নেই। কোম্পানি একবার যখন বেলপাতা শোঁকানো শুরু করেছে, ও শালারাও স্পেয়ারড্ হবে না।

ক্রমশ তীক্ষ্নতর হচ্ছে ভাষা, শুরু হয়ে গেছে ব্যক্তিগত আক্রমণ। এ এখন রোজই চলবে, টের পাচ্ছিল শুভেন্দু। এইটুকুনি তো অফিস তাদের, ইউনিয়ন নেই, অ্যাসোসিয়েশন নেই, পরস্পর পরস্পরের এত ঘনিষ্ঠ, এতদিন প্রায় এক পরিবারের মতো ছিল, সূক্ষ্ম রেষারেষি সত্ত্বেও, আর বোধ হয় সম্পর্কটা আগের মতো রইল না। তলিয়ে ভাবতে গেলে পিল্লাই সদাশিবদের আক্রোশও অর্থহীন। কোম্পানি আরও ক' বছর আগে সিদ্ধান্তটা নিলে মধুসূদনবাবু সমরেন্দ্রদা, এরাও হয়তো শুভেন্দুদের সম্পর্কে এই উক্তিগুলোই করত। আর তেল মারায় কম যায় কে? সে বছর যখন দুম করে শুভেন্দুর ইনক্রিমেন্ট স্টপ করে দিল কোম্পানি, তখনকার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের ঘরে ফাটাফাটি করতে ঢুকেছিল শুভেন্দু, পিল্লাই মুচকি মুচকি হাসছিল সেদিন। বিজন তো নির্লজ্জের মতো লোকটার হয়ে সাফাই গেয়েছিল। সদাশিব ব্যানার্জিই বা কী? কদিন আগেই মজুমদারের শাশুড়ির জন্য টিকিট কাটতে ট্রেনের বুকিং কাউন্টারে লাইন দেয়নি?

পিল্লাই সিটে ফিরে যাওয়ার পর শুভেন্দু ব্যাগ কাঁধে উঠে পড়ল। ছুটি হয়ে গেছে, তবু অফিস আজ ভরপুর। এখানে সেখানে জটলা চলছে। নিখিল দাস চেঁচিয়ে ডাকলও শুভেন্দুকে, দাঁড়াল না শুভেন্দু। আর ভাল্লাগছে না।

বাইরে এক মায়াবী বিকেল। সূর্য প্রায় ডুবডুব, তার শেষ আভা মেখে সামনের ময়দান এখন স্বপ্নের দেশ। পশ্চিমে মেঘের কুচি রঙের খেলা দেখাচ্ছে। মাঝ আকাশে এক সরু লম্বা সাদা রেখা, একটু আগে কোনও জেটপ্লেন উড়ে গেছে বোধ হয়। ছুটিভাঙা মানুষ, ব্যস্ত যানবাহন, দূরের গাছগাছালি, প্রতিফলিত রশ্মিতে উজ্জ্বল স্কাইস্ক্র্যাপারের সারি— ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো লাগে যেন। হাওয়া বইছে মৃদুমন্দ, শুকনো হাওয়া। এমন দিনে বুঝি ইচ্ছে করলেও মন খারাপ করে থাকা কঠিন।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু একটা সিগারেট ধরাল। প্যাকেটটা দেখে নিল একবার, আর পাঁচটা আছে। দিনে মোটামুটি এক প্যাকেট তার বরাদ্দ, আজ রিহার্সাল নেই, মোটামুটি কুলিয়ে যাবে। এখন কি যাবে একবার গ্রুপে? বাড়ি

ফিরে গেলেও হয়। দারিও ফোর নাটকটার অনুবাদের কাজ কিছু দূর এগিয়ে থেমে আছে, আবার উদ্যোগ নিয়ে বসা দরকার। আজ থেকেই না হয়...। কাজই শ্রেষ্ঠ ওষুধ, মনের চাপ কম থাকে। নাহ্, আজ হবে না। তিন্নি আজ সন্ধেবেলা বাড়ি থাকবে না, নন্দিতা যদি ফিরে দেখে শুভেন্দু নাটক নিয়ে বসেছে, ওমনি চটাস চটাস মন্তব্য শুরু হয়ে যাবে, শুভেন্দুও মেজাজ ঠিক রাখতে পারবে না আজ। আজই কি নন্দিতাকে জানাবে ভলান্টারি রিটায়ারমেন্টের কথাটা?

ভাবতে ভাবতে শুভেন্দু ময়দান মেট্রো স্টেশনে। এলোমেলো পায়চারি করছে প্ল্যাটফর্মে। ভিড় আছে বেশ, বেশির ভাগই অফিসযাত্রী। কলেজ পড়ুয়া তরুণ তরুণীও আছে কিছু। এরা কোত্থেকে আসে অফিসপাড়ায়? এই সময়ে? ময়দানে ঘোরাঘুরি করে বুঝি? নীল সালোয়ার কামিজ পরা একটি মেয়ের সঙ্গে তিন্নির মুখের খুব মিল। স্থির চোখে মেয়েটাকে দেখছিল শুভেন্দু, চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে নিল। তার বয়সী পুরুষের দৃষ্টি তরুণীরা উপভোগ করে না। তাকে কি প্রৌঢ় বলা যায়? প্রৌঢ়! প্রৌঢ়! শব্দটা মুখে বেশ কয়েক বার বিড়বিড় করল শুভেন্দু। শব্দটাতেও কেমন যেন ন্যুব্জ ভাব আছে। কিন্তু সে তো কুঁজো নয়! মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াল শুভেন্দু, দু হাত ছড়াল দু পাশে। ফোলাচ্ছে ফুসফুস। চোখ ঘুরিয়ে পর্যবেক্ষণ করল চামড়া, হাতে হাত বোলাল। মসৃণ, এখনও মসৃণ। চাইলে এক্ষুনি সে দৌড়ে প্ল্যাটফর্ম এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে, একটুও হাঁপাবে না। তা হলে?

আবার শূন্যতাটা দখল নিচ্ছে বুকের। ট্রেন ঢুকে গেছে, ভার মুখে কামরায় উঠল শুভেন্দু। মিনিট কুড়ির মধ্যেই শ্যামবাজার। অন্য দিন দুটো করে সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে, আজ এসক্যালেটার ধরল। সচেতন ভাবে। সিঁড়ি নয়, আজ থেকে তার জন্য ওই অনায়াস চলমান সোপানেরই নিদান দেওয়া হয়েছে।

শুভেন্দুদের গ্রুপ থিয়েটারের ঘরটা শিকদার বাগানে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা দিয়েই যাওয়া যায়, তবু গলিঘুঁজিই ধরল শুভেন্দু। এই অঞ্চলে তার দীর্ঘকালের বাস ছিল, সবে বছর সাতেক হল গেছে রানিকুঠি, এখনও পুরনো পাড়ার মায়া পুরোপুরি কাটাতে পারেনি। পথেঘাটে প্রায়ই দু চারজন পরিচিতের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, দু দশটা কথা হয়, ফুরফুরে লাগে মেজাজটা। আজ দিন খারাপ, কাউকেই চোখে পড়ল না। নিজেদের আগের বাড়ির গলির মুখ পেরিয়ে *মোড় ঘুরতেই চোখে পড়ল দত্তবাটীর রোয়াকে তিন বৃদ্ধ বসে। পাশাপাশি।* সামনেই রাস্তার কলে কাজের মেয়েরা উচ্চৈঃস্বরে ঝগড়া করছে, মুখের ভাষার কোনও লাগাম নেই, তিন বৃদ্ধ জুলজুল চোখে উপভোগ করছেন কলহ। এমন দৃশ্য জীবনে বহু বার হয়তো দেখেছে শুভেন্দু, কিন্তু আজ হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কী অদ্ভুত দৃষ্টি তিন বৃদ্ধের চোখে! যেন ওইটুকু দেখার জন্যই বেঁচে থাকা! শুভেন্দু কি আজ থেকে ওঁদের দলে? মাস পয়লায় ব্যাঙ্কে গিয়ে লাইনে দাঁড়াবে, সঞ্চিত টাকার সুদের চেক জমা দেবে, সেভিংসের পাসবই খুলে তীর্থের কাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে কাউন্টারে?

উফ্, কী অসহ্য বিবমিষা যে ভাবনাটায়!

সমিধের ঘরে জনা তিনেক এসেছে আজ। সুজিত নির্মল আর প্রণবেশ। কী যেন একটা মজার গল্প বলছে প্রণবেশ, সুজিত নির্মল হা হা হাসছে। ঘরে ছড়ানো ছেটানো চেয়ার টুল মোড়া, একটা চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিল শুভেন্দু। তেষ্টা পাচ্ছে খুব, উঠে আর কুঁজো থেকে গড়িয়ে খেতে ইচ্ছে করছে না। হাই তুলল একটা। ফাঁকা চোখে দেখল বন্ধুদের।

কথার মাঝেই নির্মলের চোখ শুভেন্দুর দিকে,—কী সাহেব? এত গোমড়া দেখাচ্ছে কেন?

শুভেন্দু চোয়াল ফাঁক করল,—এইই ... এই আর কী... প্রণবেশ দাঁত বার করল, —সাহেব কি তার সাহেবের কাছে ঝাড় খেয়েছে?

শুভেন্দুর টকটকে রঙের জন্য তার সাহেব নামটা চালু আছে বহুকাল। এই 'সমিধ' যখন তৈরি হল, প্রায় বাইশ বছর আগে, তখন অনেকেই বলত সাহেবদের দল। এক সময়ে ডাকটা শুনে বেশ রোমাঞ্চ বোধ করত শুভেন্দু, এখন ওই সাহেব ডাকটাকেই খোকন বাবলু গোছের কিছু মনে হয়।

শুভেন্দু আলতো হাসল,—সাহেবরা তো ঝাড় দেওয়ার জন্যই জন্মেছে।

—স্বর যেন আজ একটু অন্য রকম? সিরিয়াস কিছু হয়েছে?

—ওই যেমন চলে। ...ভি-আর-এস্ টি-আর-এস নিয়ে...

—তোমাদের এসে গেল নাকি?

হ্যাঁ বলাই যেত। নির্মল জানেও অনেকটা। তবু গলা দিয়ে সত্যিটা বেরোল না শুভেন্দুর। বলল, কথা তো চলছেই। যে কোনও দিনই...

—বিচ্ছিরি ব্যাপার। ...আমার ভায়রার তো আরও অ্যাকিউট প্রবলেম। চাকরি করে যাচ্ছে, মাইনে পাচ্ছে না। এই তো কদিন আগে নভেম্বরের স্যালারি মিলল। তাও ইনস্টলমেন্টে। হাঁড়ির হাল হয়েছে বেচারার। ফ্ল্যাট ট্যাট কিনে একেবারে লেজেগোবরে।

সুজিত সিগারেট ধরিয়েছে। বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বয়স, শুভেন্দুদের থেকে ঢের জুনিয়ার। সাত বছর হল জয়েন করেছে গ্রুপে। পর পর দুটো প্রোডাকশানেই মেন রোল। ইদানীং তার কথাবার্তায় চাপা ঔদ্ধত্যের সুর শোনা যায়। টিভি-সিরিয়ালেও কাজ করেছে কিছু, রাস্তাঘাটে দর্শকরা তাকে চিনতে পারে, হয়তো সেটাও কারণ।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সুজিত বলল,—সাহেবদার ভাবনা কী? বউদি আছেন, সব সামলে নেবেন।

নির্মল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠেছে, —সংসার চলাটাই কি সব? সাহেবের মতো একজন ভাইটাল মানুষ, ম্যান অফ অ্যাকটিভ হ্যাবিটস্, দুম করে বসে যাবে?

—বসে যাবেন কেন? গ্রুপের জন্য আরও বেশি করে টাইম দেবেন।

—ওতে কি সারাটা দিন কাটে? প্লাস নিজের আর্নিংয়ের তো একটা ব্যাপার

আছে।

—তাহলে ছোট পর্দায় লড়ে যান। সাহেবদার ফিগার এখনও দারুণ, পুলিশ অফিসার টপিসারের রোলে সাহেবদাকে লুফে নেবে। আরে দাদা, আমরা গ্রুপ থিয়েটাররাই তো এখন টিভির দখল নিচ্ছি।

—ডেপোমি কোরো না তো হে ছোকরা। সকাল থেকে সন্ধে অব্দি সঙের মতো বসে থেকে, অশিক্ষিত ডিরেক্টরগুলোর সামনে হাত কচলে, জোটে তো মাত্র দু পাঁচশো। তার জন্য ছুটবে আমাদের সাহেব? আর ইউ ম্যাড?

—না উনি আর্নিংয়ের কথা বলছিলেন তো...। যার যা ট্যালেন্ট আছে, তাই ভাঙিয়ে রোজগার করুক। একটু নাম হয়ে গেলে তো সাহেবদাকে সেধে নিয়ে যাবে।... তখন কিন্তু রোজগার খুব মন্দ নয়। রথীনদার এখন কত আর্নিং জানেন? দু দুখানা মেগা সিরিয়াল টেনে দিচ্ছে।... দধীচিতে এর একশো ভাগের এক ভাগ পয়সা কখনও চোখে দেখেছে রথীনদা?

—শোনো সুজিত, তোমাকে একটা কথা স্পষ্ট করে বলি। নাটক করতে আমরা ভালবাসি। অভিনয়ও। এটা আমাদের প্যাশান। প্যাশান বেচে পেট চালাব, আমরা সেই স্কুল অব থটের মানুষ নই। ভবিষ্যতে কক্ষনও তুমি এরকম কথা আমাদের সামনে উচ্চারণ করবে না।

নির্মলের আকস্মিক কড়া কথায় হকচকিয়ে গেছে সুজিত। আমতা আমতা করে বলল,—এটা কিন্তু আপনাদের বাড়াবাড়ি। অভিনয় ইজ অভিনয়। সে স্টেজেই হোক, কী পর্দায়।

—বললাম তো, আমরা তোমার পাঠশালায় পড়ি না।

সুজিত তবু গোঁয়ারের মতো বলল,—আপনারা বাসবেন্দ্রদাকে এ কথা বলতে পারবেন?

একটু থমকাল নির্মল। বাসবেন্দ্র বসুরায় তাদের সমিধের পরিচালক। কর্ণধার। সম্প্রতি ছোট পর্দায় এক আধটা অভিনয় করছে বাসবেন্দ্র। বড় পর্দাতেও।

স্পর্শকাতর প্রসঙ্গটা বুদ্ধি করে এড়াল নির্মল। বলল, —আমাদের গ্রুপের লোকের তো অন্য কোথাও অভিনয় করতে বাধা নেই। কারুরই না। তেমনি, কোথাও কোথাও না অভিনয় করার স্বাধীনতাও আমাদের আছে, তার সপক্ষে যুক্তিও আছে। সেটাকে অন্তত তুমি সম্মান করার চেষ্টা করো।

সুজিত গুম হয়ে গেল। প্রণবেশ একখানা ম্যাগাজিন বার বার পড়ছে, মাথা গলাচ্ছে না। ঢোকার সময়ে পাশের চায়ের দোকানটাতে হাত নেড়ে এসেছিল শুভেন্দু, বাচ্চাটা কেটলি হাতে ঢুকেছে। প্রত্যেকের হাতে গরম ভাঁড় ধরিয়ে দিল।

শব্দ না করে ভাঁড়ে চুমুক দিল শুভেন্দু। মনে মনে নির্মলের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করছিল। নির্মল ঠিক বুঝতে পেরেছে হঠাৎ বেকার হলে কোন জায়গাটায় বিঁধবে শুভেন্দুর। নন্দিতার রোজগারের প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিয়েও ভাল কাজ করেছে। সেই কবে কলেজে পড়ার সময়ে কফিহাউসে নির্মলের সঙ্গে পরিচয়। নিজের লিটল্ ম্যাগাজিনে তখন বুঁদ হয়ে থাকত নির্মল, চমৎকার কবিতা লিখত,

শুভেন্দুও তখন হাত মক্‌শো করছে—বন্ধুত্ব গাঢ় হতে সময় লাগেনি। নন্দিতার সঙ্গে আলাপ জোড় গৎ ঝালা, সবেরই সাক্ষী এই নির্মল। ভাঙতে ভাঙতেও নন্দিতার সঙ্গে সম্পর্কটা কেন টিকে গেছে, তাও নির্মলের জানা।

কোণের ভাঙা প্যাকিং বাক্সে শূন্য চায়ের ভাঁড় ছুড়ে দিল নির্মল, —চলি আজ।

শুভেন্দু বলল,—এত তাড়াতাড়ি উঠছ যে?

—বাড়িতে একটা ফোন আসবে। সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে।

—বাসবেন্দ্র আজ আসবে না?

—না। ওর একটা বিয়ে বাড়ি আছে। প্রণবেশ চোখ তুলল।

—তাহলে আমিও উঠি.... প্রণবেশ, তোমরা তা হলে বোসো...

বেরিয়ে এসে শুভেন্দু সিগারেট ধরাল, একটা নির্মলকেও দিল। হাল্‌কা গলায় বলল, —তুমি হঠাৎ সুজিতের ওপর অত খেপে গেলে কেন?

—ওকে একটু কড়কানোর দরকার ছিল। বড় ছোট জ্ঞান নেই...

—ও কিন্তু বাসবেন্দ্রর খুব পেয়ারের। সব রিপোর্ট করবে।

—সো ব্লাডি হোয়াট? বাসবেন্দ্র ওকে মাথায় তুলেছে বলেই তো আমার ওকে ঝাড়ার ইচ্ছে হল। বাসবেন্দ্র বুঝুক, আমরা ওর স্ট্যান্ডগুলো লাইক করছি না। মনে আছে, সুপ্রিয়াকেও কেমন মাথায় তুলেছিল? আল্টিমেট্‌লি হোয়াট ডিড সমিধ গেইন? সে এখন মধুক্ষরার হয়ে স্টেজ কাঁপাচ্ছে, আর সর্বত্র সমিধের কুচ্ছো গেয়ে বেড়াচ্ছে।

—হুঁ, বাসবেন্দ্র অনেক বদলে গেছে।

—তুমি আজ একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ? প্রণবেশ ওয়াজ টোটালি সাইলেন্ট? অথচ তার আগে খুব হ্যা হ্যা করছিল...

—নিজেও সিরিয়াল টিরিয়াল করে তো, তাই...

—নাহ্‌। ওর মধ্যে একটা সাইকোফ্যান্সি গ্রো করেছে। বাসবেন্দ্র হচ্ছে এখন ওর ডেমি গড। বাসবেন্দ্রর প্রিয়পাত্রকে আঘাত করা মানে... বুঝতেই পারছ! অথচ আমাদেরও মুখের ওপর কিছু বলতে পারছে না...। শব্দ করে হাসল নির্মল, পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেল,—এই অ্যাটিটিউডটা আমার ভাল লাগছে না সাহেব। যদ্দিন গ্রুপ ছোট ছিল, ঠিক ছিল। নাউ উই আর নট দ্যাট স্মল। এখন আমাদের গ্রুপের পলিসি, মটো, সব রিভিউ করা দরকার। তোমার কী মনে হয়?

—হুম। শুভেন্দু মাথা নাড়ল,—একদিন টোটাল গ্রুপ নিয়ে বসতে হবে।

টাউন স্কুলের উল্টো দিকে এসে দাঁড়িয়ে গেল দুই বন্ধু। নির্মল ঘড়ি দেখল একবার। জিজ্ঞেস করল,—তুমি কি এখন স্ট্রেট বাড়ি ?

—কোথায় আর যাব ! খোঁটা বাঁধা আছে না !

—চলো না আমার ওখানে। একটু আড্ডা ফাড্ডা মারি। মঞ্জরী সেদিনও বলছিল, সাহেবদা আমাদের ভুলেই গেছে।

—তোমার তো আবার কী সব ফোন টোন আসবে ?

—আরে ধুত, আমার এক কলেজকলিগ করবে। কলেজের একটা ফালতু ইসু নিয়ে...। চলো চলো।

একটু ইতস্তত করে শুভেন্দু রাজিই হয়ে গেল। সত্যি বলতে কী, তাড়াতাড়ি ফিরে একা আজ নন্দিতার মুখোমুখি হওয়ার কোনও মানেই হয় না।

সময় কাটল বেশ। মঞ্জরী দারুণ খুশি, ছাড়তেই চায় না, ছাড়তেই চায় না, শুভেন্দু বেরোল রাত সাড়ে নটায়। বাড়ি ফিরে দেখল লিভিংরুমের বড় আলো নেবানো, স্ট্যান্ডল্যাম্প জ্বলছে, আলো আঁধারের আবছায়া মেখে সোফায় বসে আছে নন্দিতা, টিভিতে নিমগ্ন।

বাড়ি ঢোকার সময়েই চাপটা ফিরে এসেছিল আবার, নন্দিতাকে দেখে হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল শুভেন্দুর। কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব অচঞ্চল রেখে শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করল,—তিন্নি ফিরেছে ?

—হুঁ। সোফার আবছায়া সামান্য কাঁপল।

—কখন ফিরল ?

—তোমার আগে। টাইম দেখিনি।

শুভেন্দুর গলা পেয়েই ঘরের দরজায় উঁকি দিয়েছে তন্নিষ্ঠা। হাতের ইশারায় ডাকল শুভেন্দুকে।

মেয়ের ঘরে এসে বাঁচল শুভেন্দু,—কী রে ?

—আমার ড্রেসটা কেমন হয়েছিল দ্যাখো !. তন্নিষ্ঠা হাতে আঁচল ছড়িয়ে দিল,—বলো, কেমন লাগছিল ?

গাঢ় দৃষ্টিতে মেয়েকে নিরীক্ষণ করল শুভেন্দু। ঘন নীল কাঞ্জিভরম পরেছে তিন্নি, গলায় মুক্তোর নেকলেস্, কানে মুক্তো, হাতে মুক্তো, খোঁপায় জুঁইমালা, কপালে ছোট্ট টিপ। মুখে গোলাপি আভা ফুটছে তিন্নির, এ নিশ্চয়ই মেকআপের নয় ? তিন্নির চোখের মণি কি এত কাজলকালো ?'

শুভেন্দুর বুকটা ঢিপঢিপ করে উঠল। শাড়ি পরলে মেয়েটাকে এমন নন্দিতা নন্দিতা লাগে কেন ?

তন্নিষ্ঠা অধৈর্য ভাবে বলল,—কী, বলো ?

—মার্ভেলাস। পারফেক্ট। মুক্তোটা দারুণ লাগছে।

তন্নিষ্ঠা ঠোঁট ফোলাল,—মা বলল মুক্তোটা নাকি শাড়ির সঙ্গে ম্যাচই করেনি।

—মার কথা বাদ দে। মেয়েদের ড্রেসের আসল সমঝদার হল পুরুষরা, এ তোর মা জানেই না।

কথাটা মনে ধরেছে তন্নিষ্ঠার। ঝলমলে মুখে বলল,—অভিমন্যুও খুব প্রশংসা করছিল।

—সে কে ?

—ও একটা পাগলা পাগলা ছেলে। মালবিকার বরের বন্ধু। গন্ধের কারিগর।

—সেটা কী জিনিস ?

—পারডিউম তৈরি করে। নিজের ফ্যাক্টরি আছে। কেমিস্ট্রিতে এম এসসি,

একটা ল্যাবরেটরিতে কাজ করত, কী সব ঝগড়া টগড়া করে ছেড়ে দিয়ে...। আমাকে আজ পারফিউম প্রেজেন্ট করেছে একটা। দেখবে ?

বলেই তন্নিষ্ঠা ড্রেসিংটেবিল থেকে একটা শিশি তুলে বাড়িয়ে দিয়েছে।

শুভেন্দু দেখল শিশিটা। বিশেষত্বহীন চেহারা, ভেতরের তরলটা একটু বেশি হলুদ। নামটা মন্দ নয়, ডিউ ড্রপ। মুন ড্রপ থেকে ঝেড়েছে বোধহয়। নাকের কাছে এনে শুঁকল একটু, —এহ্, গন্ধটা তো খুব চড়া রে !

—হ্যাঁ, গ্রামবাংলায় ব্যাচে তো। শিশিটা নিয়ে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিল তন্নিষ্ঠা, —গন্ধটা আমারও ভাল লাগেনি। হাতে করে দিল, রিফিউজও করা যায় না।

শুভেন্দু বলল,—তোর মালবিকার বিয়ে-এপিসোড তাহলে ওভার ?

—ভেরি মাচ ওভার। ওরা কালই হানিমুনে বেরিয়ে যাচ্ছে। লোলেগাঁও।

—সামনের বছর তুমিও এই সময়ে যেও। শুভেন্দু মেয়ের গালে ছোট্ট টোকা দিল, —জায়গা চুজ করে রেখেছিস ?

—শৌনকের ইচ্ছে সুইজারল্যান্ড ! আমার ইচ্ছে ডায়মন্ডহারবার। তন্নিষ্ঠা ফিকফিক হাসছে, দেখি মাঝামাঝি কোথায় রফা হয় !

দরজায় নন্দিতার ছায়া,—বাপ মেয়ের আহ্লাদীপনাই চলবে ? নাকি বাপের কিছু মুখে তোলা হবে ?

শুভেন্দু সিঁটিয়ে গেল সামান্য। বলল, —দাও, আমি আসছি।

—দয়া করে এসো। সকালে আমার অফিস কাছারি থাকে, রাত করে শুলে আমার অসুবিধা হয়।

শুভেন্দুর ফুসফুসে যেটুকু খুশির বাতাস জমেছিল বেরিয়ে গেছে। নন্দিতা সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল, কী ভেবে ফিরে এল। হঠাৎ মেয়ের মুখের সামনে দুটো আঙুল নাচাতে শুরু করেছে,—এই তিন্নি, ধর তো একটা।

তন্নিষ্ঠা বিস্মিত ভাবে বলল, —কেন ? কী হবে ?

—আহ্, ধর না।

শুভেন্দুর দিকে তাকাতে তাকাতে খপ করে মধ্যমাটা চেপে ধরেছে তন্নিষ্ঠা। মুহূর্তে শুভেন্দুর মুখ খুশিতে ভরে গেল,—বাঁচালি।

—মানে ?

—তোর মাকে আজ বলতে হবে না।

—কী ?

—আছে একটা কথা। ভাবছিলাম আজ জানাব, না পরে জানাব !

—কী কথা ? হেঁয়ালি কোরো না, বলো না!

শুভেন্দু গলা নামাল,—অফিসে আজ আমার গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের ফতোয়া এসেছে। তিন মাসের মধ্যেই ছুট্টি।

পলকে তন্নিষ্ঠার মুখখানা শুকিয়ে ছোট্ট হয়ে গেল। প্রায় আর্তস্বর ছিটকে এসেছে,—মানে তোমাকে বসিয়ে দিচ্ছে ?

—আহ্, চুপ চুপ। মেয়ের মুখে হাত চাপা দিল শুভেন্দু,—চেঁচাচ্ছিস কেন ? এই মাত্র ডিসিশান হয়েছে না, তোর মা আজ জানবে না ?

তন্নিষ্ঠা ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে আছে।

শুভেন্দু মুখ ঘুরিয়ে নিল। মেয়েকে চোখের জল না দেখানোই ভাল।

তিন

অভিমন্যু হনহন হাঁটছিল। দেরি হয়ে গেছে খুব। সমীরণকে পাক্কা নটায় কারখানায় আসতে বলেছিল, এখন নটা চল্লিশ। সেলুনের ছেলেটা সামান্য দাড়ি ট্রিম করতে এত সময় লাগিয়ে দিল ! কান এফ-এম্ চ্যানেলের গানে, মুখে অবিরাম পাড়ার ঘোঁট, হাতের কাঁচি চলবে কী করে ! সমীরণটা যা উড়ুউড়ু টাইপ, ফস করে না কোনও কাজের ছুতোয় পালিয়ে যায় ! গোবিন্দ মালতীরা যদি বুদ্ধি করে ছেলেটাকে আটকে রাখে তো মঙ্গল।

—এই অভিদা, অভিদা... ?

উল্টো ফুটে ভোলা। ল্যাম্পপোস্টে ঠেসান দিয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে হাঁক পাড়ছে।

অভিমন্যু বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল, —কী বলছিস ?

—তোমায় ননীদা কাল থেকে খুব খুঁজছে।

—কেন, কী দরকার ?'

—বলতে পারব না। তবে মনে হয় হেব্‌বি আজ্‌জেন্ট। ননীদা পার্টি অফিসে আছে, একবার দেখা করে যাও।

কথার ভঙ্গিটায় সামান্য হুকুম মেশা। স্বাভাবিক। ননী সেন এ অঞ্চলের খুদে রাজনৈতিক নেতা। তার দাপটে কুকুর বেড়ালে এক ডাস্টবিনের খাবার খায়। অভিমন্যু অবশ্য ননী সেনকে ডরায় না। তবে ননীর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কও খারাপ নয়, মোটামুটি একটা পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা আছে, দায়ে অদায়ে ননী তাদের পাশেও দাঁড়িয়েছে অনেক বার। বাড়িউলির সঙ্গে ঝামেলায়, দাদার অসুখের সময়...। চামচার কথাবার্তার ঢং যেমনই হোক, ননী সেনের মনটা ভালই।

অভিমন্যু ভুরু কুঁচকোল। সে রাজনীতির সাতে পাঁচে থাকে না, পার্টি অফিসে ঢোকায় তার একটু আড়ষ্টতা আছে। তা ছাড়া এই তাড়াহুড়োর সময়ে...

সামান্য দোনামোনা করে পার্টি অফিসেই এল অভিমন্যু। সুন্দর সাজানো গোছানো ঘর। কাচ লাগানো সেক্রেটারিয়েট টেবিল, আট দশখানা চেয়ার, কয়েকটা ফাইবার গ্লাসের লাল টুকটুকে টুল, দুখানা স্টিলআলমারি, গদিমোড়া বেঞ্চি, সবই পরিপাটি ভাবে বিন্যস্ত। দেওয়ালের ছবিগুলোও ঝকঝক করছে, দেখে বোঝা যায় রোজ মোছা হয়। ঘরখানার এককালে বেশ ভগ্ন দশা ছিল। টিনের চাল, ফাটাফাটা মেঝে, মলিন আসবাব...। এখনও অবশ্য তার স্মৃতি আছে

এক আধটা। যেমন ওই কোণে পড়ে থাকা ভাঙা শোকেসখানা।

ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জনা আট দশ লোক। যুবকই বেশি, বয়স্কও আছে এক আধজন। কেজো আলাপ চলছে।

ননী সেনের চোখ খবরের কাগজে। পাশ থেকে এক যুবক তার কানে কী যেন বিনবিন করে চলেছে, পড়তে পড়তেই মাথা দুলিয়ে চলেছে ননী। যুবকটির মুখ আধচেনা মতো লাগল অভিমন্যুর, বাজার টাজারে দেখেছে বোধহয়।

গলা খাঁকারি দিল অভিমন্যু,—কী ননীদা, আমায় হঠাৎ তলব কেন?

বছর পঁয়তাল্লিশের ননী মুখ তুলে একগাল হাসল,—আয় আয়...

—জলদি জলদি বলো, আমার তাড়া আছে।

—তুই মিনি ইন্‌ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের মতো কথা বলছিস দেখি? পল্টু, দুটো লিকার-চা বলে দে তো।...তারপর বল্, তোর কারখানা চলছে কেমন?

ওফ্ খাজুরা শুরু হল! অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসল অভিমন্যু। হেসে ফেলল,—আমাদের মতো সুপার স্মল স্কেলরা যেমন চলে, তেমনই চলছে। লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে যায়, আমরা কারখানার মালিক হয়েছি এই আনন্দে ঘরে বসে আঙুল চুষি।

—কেন? তোর মাল চলছে না?

—ধরছে আস্তে আস্তে। টাইম লাগবে। গাঁ গঞ্জের বাজার, লোকে আলু পেঁয়াজ কিনবে, না সেন্ট মাখবে?

—লোকাল দোকান ফোকানে দিস না?

—চেনা জায়গায় মার্কেটিং করার বহুত হ্যাপা। সাধাসাধি করলে হয়তো একটা দুটো রাখল, তবে দাম দেওয়ার সময়ে রোজই বলে কাল এসো, পরশু এসো...। বিক্রি হয়ে গেলেও। কাঁহাতক ঝগড়া করি বলো তো?

—হুম্, সর্বত্রই প্রবলেম! দোকানদার দোকানদারের মতো করে ভাবে, তোরা তোদের মতো করে দেখিস। আমাকে দিস্ তো কয়েকটা, বনমালীকে বলব রাখতে। আমি দিলে ও তোর পেমেন্ট মারতে পারবে না।

হ্যাঁহ্, তারপর চারদিকে কায়দা করে শোনাও তুমিই ব্যবসাটা দাঁড় করিয়ে দিলে! মনে মনে আওড়াল অভিমন্যু, মুখে কিছু বলল না। জিভটা উশখুশ করছে একটা সিগারেটের জন্য। ধরাবে এখানে? পথেঘাটে সে ননী সেনের সামনেই সিগারেট খায়, কিন্তু এখন যেন কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। ননীর গুহায় বসে আছে বলে? চিন্তাটাতে যেন সামান্য দাসত্ব রয়ে গেছে? অভিমন্যু পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বারই করে ফেলল। ধরাল একটা, প্যাকেটটা ননী সেনকে বাড়াল না। থাক, ননীদা হয়তো অপমানিত বোধ করতে পারেন।

ননীর মুখে ভাবান্তর নেই। যেন অভিমন্যুর সিগারেট ধরানোটা খেয়ালই করেনি। সহজ সুরে বলল,—তারপর, তোর বিজ্ঞানমঞ্চ চলছে কেমন?

—চলতা হ্যায়। শো হচ্ছে মাঝে মাঝে। দু তিনটে নতুন ছেলেমেয়ে এসেছে, কলেজের ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার....দারুণ জিল্ আছে। আবার ঘড়ি দেখল

অভিমন্যু,—কী বলবে বলছিলে, বললে না?

—এই কথাটাই। এই তোর বিজ্ঞানমঞ্চ। তোকে একটা শো করতে হবে।

—কবে? কোথায়?

—একটা কলেজে। সাউথেই। এপ্রিলের ফার্স্ট রোববার। চার তারিখ।

—হুঁউ, করা যেতে পারে। অভিমন্যু একটু উদ্দীপিত বোধ করল,—কী ধরনের প্রোগ্রাম চাই?

—ওই, সব কিছু একটু মিলিয়ে মিশিয়ে। গ্লাসে কালো চা এসে গেছে, অভিমন্যুকে গ্লাস এগিয়ে দিল ননী,—আমার ভাইঝি পড়ে ওই কলেজে। একটু ইউনিয়ন টিউনিয়নও করে। এবার ওদের কলেজের সিলভার জুবিলি। অনেক ফাংশান টাংশান হবে, ইউনিয়নের ইচ্ছে একটা এগ্‌জিবিশানও হোক।...সেখানেই যদি জেনারেল অ্যাওয়্যারনেসের জন্য কিছু একটা করিস্‌...। এই ধর, তোদের স্লাইড্‌শো, কিছু হাল্‌কা ডেমনস্ট্রেশান, সঙ্গে তোদের ওই যে কী সব ভণ্ডামি বুজরুকি ধরার টেস্ট ফেস্ট আছে না...!

—বুঝেছি। খিচুড়ি প্রোগ্রাম...। তা মালপত্র সব নিয়ে যাব, ট্যাক্সি ভাড়া টাড়া দেবে তো?

—নিশ্চয়ই দেবে। ইউনিয়ন যখন অ্যারেঞ্জ করছে...। জগন্নাথদা ওই কলেজের প্রেসিডেন্ট। উনি নিজে সব দেখভাল করছেন। ওঁর পারসোনাল ইচ্ছে এই ধরনের কিছু একটা হোক। বেশির ভাগ কালচারাল প্রোগ্রাম তো এখন অপসংস্কৃতি, তার মধ্যে কিছু সুস্থ চিন্তাভাবনাও থাকুক।

অভিমন্যুর কপালে ভাঁজ পড়ল,—প্রোগ্রামটা তোমাদের পার্টির ক্যাম্পেন নয় তো?

—আরে না না। হচ্ছে রজতজয়ন্তী উৎসব, সেখানে আবার ক্যাম্পেন কী? ননী শব্দ করে গ্লাসে চুমুক দিল। হাসতে হাসতেই বলল,—তোর এত ছুতমার্গ কীসের রে? তোরা তোদের মতো শো করবি, পাবলিক দেখবে, শুনবে, জানবে....কারা অ্যারেঞ্জ করছে তাই নিয়ে তোর কীসের মাথাব্যথা? কী আসে যায় তোর?

—আমার আসে যায় ননীদা। অভিমন্যুও হাসি ধরে রাখল ঠোঁটে। মৃদু শ্লেষের সুরে বলল,—তোমাদের কৃপায় তো কিছুই আর রাজনীতির বাইরে রাখার উপায় নেই, অনেক কষ্টে আমাদের ইউনিটটা এখনও অ্যাপলিটিকাল রেখেছি। আমি চাই সেরকমই থাকুক।

ননীর হাসি ঈষৎ শীতল হল,—তুই কী মিন করতে চাইছিস, তুইই জানিস।...তোদের ডেকে এসব অনুষ্ঠান করা কি খারাপ কাজ?

—কোনও কাজই নিখাদ খারাপ ভাল হয় না ননীদা। কাজটা কী উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে, সেটাই ভাল মন্দ মাপার একমাত্র মাপকাঠি। অভিমন্যু উঠে পড়ল।

—প্রোগ্রামটা তাহলে করবি না?

—নাহ্‌, তোমার ভাইঝি আছে যখন, করে দেব। এক কাজ করো, তোমার

ভাইঝিকে বলো আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে। টাইম ফাইমগুলো ওর সঙ্গে ডিস্কাস্ করে নেব।

বেরিয়ে এসে আর একটা সিগারেট ধরাল অভিমন্যু। মনটা একটু খচখচ করছে। রাজি না হলেই কি ভাল হত? থাক গে, ননীদাকে এটা অন্তত তো বোঝানো গেছে, সে হুকুম করলেই ল্যালল্যাল করে ছুটবে না অভিমন্যু। সরাসরি ননীদার মুখের ওপর না বলে দেওয়াটাও বোধহয় অকৃতজ্ঞতা হত।

রোদ বেশ চড়া আজ। দশটা বাজতে না বাজতেই তেতে গেছে পৃথিবী। ধুলো উড়ছে। চৈত্র মাস আসার আগেই ছোট ছোট ঘূর্ণি তৈরি করতে শুরু করেছে বাতাস।

অভিমন্যুর কারখানা দু মিনিটের পথ। একটা দোতলা বাড়ির একতলায়। পিছন দিকে। দরজায় সাইনবোর্ড 'মনামি কেমিক্যালস্।' ঢুকে সরু ফালি প্লাইউড ঘেরা জায়গা। অফিস। লাগোয়া ঘরখানা প্রোডাকশান রুম। ঘরের একদিকে জার বিকার শিশি বোতল অ্যাটোমাইজার স্তূপ, পারফিউম বক্স, অন্য দিকে দুখানা ক্যাপ সিলিং মেশিন। ছোট ঢাকা উঠোনও আছে একটা, সেখানে প্যাকিং বক্সের ডাঁই, ভাঙা শিশি, ছেঁড়া পিজবোর্ড, দুটো চারটে বস্তাও।

কারখানার বাইরে থেকেই সমীরণের গলা পেল অভিমন্যু। আছে এখনও। জোর জেরা করছে গোবিন্দকে, —ডিভাইনের গন্ধটা সাস্টেন করার জন্য কী মেশাচ্ছ বলো তো?

অভিমন্যু দাঁড়িয়ে পড়ল। গোবিন্দ মিনমিন করে কী যেন বলছে।

আবার সমীরণের স্বর, —না না, ওসব পাতি জিনিস মেলালে হবে না, ফরেন কেমিক্যালস্ কিছু মেশাচ্ছ কি?

—কোনটা ফরেন, কোনটা অ-ফরেন আমরা কী করে জানব? দাদা যেভাবে যা বলেন, আমরা করে যাই।

—হ্যাহ্, দাদা! দাদাকে তো আর রেগুলার পাবলিক ফেস্ করতে হয় না...। জামাকাপড়ে সেন্টের দাগ লেগে থাকছে কেন শুনি? বেস্'টা কী দাও? অয়েল?

—না, আমরা তো জল ব্যবহার করি।

—জল? আমি জল মেশানো মাল ফিরি করে বেড়াই? তিড়িং বিড়িং লাফাচ্ছে সমীরণ, তাই এত কমপ্লেন! নাহ্, দাদাকে বলতে হবে, এসব জালি জিনিস চলবে না।

অভিমন্যু নিঃসাড়ে ঢুকে অফিসের চেয়ারে বসল। আপন মনে হেসে নিল একটু। নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যালকোহলে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করা হয়, তারই বাজারচলতি নাম জল। মাস তিনেক হল সমীরণ চাকরিতে ঢুকেছে এখানে, আগে বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাটলারি সেট, হাতা খুন্তি, ইস্ত্রি, এসব বেচত। এখনও গন্ধ-ব্যবসার সন্ধ্যাভাষা তার রপ্ত হয়নি।

হাসি চেপে গলা ওঠাল,—সমীরণ, ওটা তোমার এরিয়া নয়। ওদের শান্তিতে কাজ করতে দাও, তুমি এখানে এসো।

সমীরণ গটগটিয়ে চলে এল। বসেছে চেয়ারে। এক গাল হেসে বলল,—দাদা আজ এত লেট করলেন? আমার এক মাসি থাকে বেহালা চৌরাস্তায়, মাসিকে একটা জমির খবর দেওয়ার ছিল, ভাবছিলাম ঘুরে আসি....

—ভাগ্যিস যাওনি। একবার কেটে পড়লে তো তোমার টিকি পাওয়া যেত না।

—যাহ্। কী যে বলেন দাদা! বারোটার মধ্যেই চলে আসতাম।

—ঠিক আছে। এবার তোমার রিপোর্ট টিপোর্টগুলো দাও। শোনাও তোমার নদিয়া ভ্রমণের বার্তা।

সমীরণ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে ব্রিফকেস খুলল। কাগজপত্র বার করছে। তার বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশি নয়, ডিগডিগে লম্বা, রং ফর্সার দিকে, খাড়া নাক, মুখে একটা চোয়াড়ে চোয়াড়ে ভাব আছে। চোখের মণি সতত সঞ্চরণশীল, চড়ুইপাখির মতো। সর্বদাই টিপটপ থাকে সমীরণ, এই গরমেও তার শার্টের হাতা কব্জি অবধি নামানো।

অর্ডার ফর্মের প্যাডগুলো অভিমন্যুকে দিল সমীরণ। দেখছে অভিমন্যু, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সপ্রশংস উক্তি বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে। ভালই অর্ডার এনেছে তো সমীরণ! বেথুয়াডহরি পলাশি নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর শান্তিপুর রানাঘাট চাকদা— অনেক জায়গা চষেছে। এমন কয়েকটা ডিস্ট্রিবিউটারের অর্ডার আছে, যাদের কাছে অভিমন্যু নিজে গিয়েও দাঁত ফোটাতে পারেনি। নাহ্, ছেলেটার এলেম আছে, এ একটু আধটু চাঁট মারতেই পারে।

হাত বাড়িয়ে হোয়াট-নট থেকে একটা গার্ডফাইল টানল অভিমন্যু, অর্ডারগুলো সাজাচ্ছে একে একে। কাগজ টেনে যোগ শুরু করল। অর্ডার আর অ্যাডভান্সের পরিমাণ।

সমীরণ সোজা হয়ে বসেছে,—দাদা, এবার কিন্তু লোকনাথ এজেন্সি খুব কথা শুনিয়েছে।

—কী বলছে?

—আপনি ওদের মালের সঙ্গে গিফট্ দেবেন বলেছিলেন, অথচ লাস্ট লটেও কিচ্ছু যায়নি....

—হুম্, পাঠানো হয়নি।...কী গিফট্ দিই বলো তো?

—একটা করে চামচ দিতে পারেন?

—চামচ! অভিমন্যু হিসেব থেকে চোখ তুলল,—আমি কি কাশির সিরাপ বেচছি, যে সঙ্গে চামচ দেব?

—সস্তা হত। বড়বাজার থেকে লটে কিনলে পঁচাত্তর পয়সা।

দিনকাল কী পড়েছে! কাস্টমার মালের সঙ্গে যা হোক একটা কিছু ফ্রি পেলেই খুশি! কীসের সঙ্গে কী ম্যাচ করে তাই নিয়ে কে মাথা ঘামায়!

অনেক ডিস্ট্রিবিউটারই এবার অগ্রিম টাকা পাঠিয়েছে, অর্থের পরিমাণ নেহাত কম নয়, সমীরণের কাছ থেকে টাকা চেক সব বুঝে নিল অভিমন্যু। বকেয়া

পেমেন্টও বেশ কিছু এসেছে, সেটাও। এখন কয়েক মাস বাজার মন্দ যাবে না, টাকাপয়সা বড় একটা পড়ে থাকবে না মার্কেটে। গ্রীষ্ম আসছে। গরমকালের একটা অন্তত সুফল আছে, গায়ে বগলে ঘাম জমে খুব, লোকে সময় অসময়ে সুগন্ধী হাতড়ায়। পুজোর পর থেকে আবার শীতলতা, তখন এই সব ডিস্ট্রিবিউটাররাই দাঁত নখ নিয়ে স্বমূর্তিতে বিকশিত হবে। পঞ্চাশটা টাকা পেমেন্ট পেতেও তখন যে কী যন্ত্রণা! তিন বছর আগে, যখন নতুন ব্যবসায় নেমেছিল অভিমন্যু, এক একদিন কান্না পেয়ে যেত। সেই কোন দূরে পেমেন্ট কালেকশানে গেছে, ভোরবেলা বেরিয়ে সন্ধে পর্যন্ত হাট মাঠ চষেছে, ফেরার সময়ে ট্রেনে বসে দেখছে পকেটে মোটে এক টাকা নব্বই! কানে বাজছে ডিস্ট্রিবিউটারদের বুকনি, সাত দিন হল কারবার খুলে পেমেন্ট নিয়ে পাগল করে দিচ্ছেন! পাবেন পাবেন, আমরা কারুর টাকা মারি না! এই শুনে শুনে কত হাজার টাকা গর্তে ঢুকে গেল, কতজন যে আর উপুড়হস্ত করল না! বাবার পি এফের কতটাই যে জলে গেছে! এখনও কি সামলেছে পুরোপুরি? ভাবতে ভয় হয়, প্রতি মুহূর্তে মনে হয় পায়ের নীচে যেন চোরাবালি।

একটু বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অভিমন্যু, সমীরণের ডাকে সম্বিত ফিরল,—দাদা, একটা কথা ছিল!

—বলো।

—লাস্ট লটের মালে কিন্তু কিছু কমপ্লেনও আছে।

—শোনা হয়ে গেছে। অভিমন্যু আলগা হাসল,—গন্ধটা কেন অনন্তকাল থাকছে না, জামাকাপড়ে কেন দাগ লাগছে, তাই তো?

চোখেমুখে কথা বলা ছেলেটা লজ্জা পেয়ে গেল,—হ্যাঁ, মানে....

—শোনো। যে দামে আমরা মাল দিই তাতে কি ফরাসি পারফিউম হবে? তাও তো আমি নিজে খেটে খেটে, গন্ধগুলো ইনভেন্ট করছি, কমন কোনও সুগন্ধের সঙ্গে এগুলো মিলবে না....এর বেশি আমি কী করতে পারি বলো? আর হ্যাঁ, লাস্ট লটটা আমি একটু অন্য ভাবে এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম, ফাইনাল টেস্টটা হয়ে ওঠেনি, তার জন্যই হয়তো দাগ টাগ...। তুমি ওদের বোলো কমপ্লেন-আসা মালগুলো পাঠিয়ে দিতে, আমি চেঞ্জ করে দেব। ঠিক হ্যায়?

ঢক করে ঘাড় নাড়ল সমীরণ। ব্রিফকেস খুলে আর এক তাড়া কাগজ বার করে বাড়িয়ে দিয়েছে। গলা নামিয়ে বলল,—এবার কিন্তু একটু টি.এ বেশি আছে দাদা।

—কত?

—চোদ্দশো ষাট।

চমকাল অভিমন্যু,—এত?

—হবে না? কতগুলো জায়গায় ঘুরেছি, ছ'টা নাইট স্টে আছে....ট্রেনভাড়া বাসভাড়া কিছুই তো আর কম নেই দাদা! কৃষ্ণনগরের ডিস্ট্রিবিউটরকে একদিন আবার খাওয়াতে টাওয়াতে হল...

অভিমন্যু টি.এ বিলগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিল। নিখুঁত হিসেব সাজানো, তবে স্বচ্ছন্দে গোজামিলগুলো ধরে ফেলা যায়। এই সব প্রত্যেকটি জায়গাই তার চষা, কোথায় কেমন হোটেল খরচা লাগতে পারে মোটামুটি জানে সে। সমীরণ থাকেও ব্যারাকপুরে, কদিন কোথায় রাত্রিবাস করেছে তাতেও সন্দেহ আছে।

সমীরণকে কোনও কূট প্রশ্ন করল না অভিমন্যু। জামাকাপড়ে যতই কেতাদুরস্ত হোক ছেলেটা অভাবী, বাপ মারা যাওয়ার পর বি কমটা পর্যন্ত শেষ করতে পারেনি, মা আর তিন ভাইবোনের সংসার প্রায় একাই টানছে। কত আর মাইনে দিতে পারে অভিমন্যু? পনেরো শো টাকায় কী হয় আজকের দিনে? নয় দু চারশো টাকা বেশি নিলই। খাটছে তো।

ক্যাশবক্স থেকে টাকা বার করতে করতে অভিমন্যু জিজ্ঞাসা করল,—তোমার মা কেমন আছেন?

—চোখের প্রবলেমটা খুব ভোগাচ্ছে মাকে। ডাক্তার বলছে একটা অপারেশন করতে হবে।

—করিয়ে নাও।.....দরকার হলে কিছু অ্যাডভান্স নিও, মাসে মাসে কাটিয়ে দেবে।

—দেখি। টাকা ব্রিফকেসে ঢোকাল সমীরণ। ডালা আটকাতে আটকাতে বলল, দাদা, আমার আরও একটা কথা ছিল।

—কী?

—সামনের মাসে আমি দিন সাতেকের ছুটি নেব। তখন কিছু অ্যাডভান্সও লাগবে কিন্তু, শ পাঁচেক।

—কেন?

—শুশুনিয়া যাব।

—বেড়াতে?

সমীরণ হেসে ফেলল,—না। আমার একটা বদ নেশা আছে। মাউন্টেনিয়ারিং। সামনে মাসে আমার ট্রেনিং ক্যাম্প।

—এ নেশা জোটালে কোত্থেকে?

—ছোটবেলা থেকে পাহাড় আমায় ভীষণ টানে দাদা। আর ওই স্পোর্টটা......মানে.....খুব অ্যাডভেঞ্চারাস তো। টাকা জমিয়ে এর আগেও আমি একবার ট্রেনিং নিয়ে এসেছি।.....আমার ভীষণ ইচ্ছে করে, একবার মাউন্ট এভারেস্টে উঠব।

বুকের ভেতরটা শিরশির করে উঠল অভিমন্যুর। ঝলক দেখল সমীরণকে। আহারে এমন স্বপ্ন নিয়েই তো বাঁচে মানুষ। স্বপ্নটা আছে বলেই বোধহয় এরকম চরকির মতো ঘুরতে পারে ছেলেটা, ওই ল্যাগবেগে চেহারায় অসুরের মতো পরিশ্রম করতে পারে। দীনহীন প্রাত্যহিক জীবনটাও হয়তো ওর সহনীয় হয়ে উঠেছে এই স্বপ্নের কল্যাণে। সে নিজেও যে এই সুগন্ধীর ব্যবসা করছে, সবটাই কি পেশা?

অভিমন্যু হাত নেড়ে বলল,—সব হবে, সব হবে। আগে তুমি একবার বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টটা ট্যাপ করে এসো তো। রাজরানি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে মাল তোলেনি, শ্রীদুর্গার তিনটে পেমেন্ট ডিউ হয়েছে, তোমার প্রিডিসেসর তো মাল দিয়ে চলে গেল, আমার যে চুল পেকে যাচ্ছে! আসানসোল মার্কেটেও বাসব ব্রেক থ্রু করতে পারেনি, দ্যাখো তুমি যদি.....

—কবে নাগাদ বেরোতে হবে?

—এ উইকটা রেস্ট নিয়ে নাও। তোমার নর্থ চব্বিশ পরগনার ডিস্ট্রিবিউটারদের সঙ্গে দেখা টেখাগুলো সারো......। কটা মাস যাক তোমাকে আমি খানিকটা হালকা করে দেব, আরও দুজন সেল্সম্যান....

—আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না কিন্তু।

—তা বলে তুমি একাই গোটা বেঙ্গল টানবে নাকি? শিলিগুড়ি বেল্টটা তো ছোঁয়াই হয়নি কোনওদিন।

আরও দু চারটে কাজের কথা বলে চলে গেল সমীরণ।

অভিমন্যু পাশের ঘরে এল। গোবিন্দ আর মালতী কাজ করছে মন দিয়ে। মেজারিং সিলিন্ডারে মেপে মেপে অতি সন্তর্পণে শিশিতে সুগন্ধী ভরছে মালতী, গোবিন্দ একটা একটা করে অ্যাটোমাইজার লাগিয়ে সিলিং মেশিনে চাপাচ্ছে। গোবিন্দর বয়স বছর পঁচিশ, পাড়ারই ছেলে। মালতী আসে করুণাময়ী থেকে, বিবাহিত, বাচ্চা কাচ্চা আছে, স্বামীর কারখানা লকআউট, সে'ই এখন সংসারের হাল। চব্বিশ পরগনা নদিয়া হাওড়া হুগলি বর্ধমান মিলিয়ে গোটা চল্লিশেক জায়গায় এখন অভিমন্যুর মাল যায় বটে, তবে কোথাওই একবারে ছ আট ডজনের বেশি নয়, এই দুজনেই এখনও পর্যন্ত কাজ উঠে যাচ্ছে। এতেই টার্নওভার মন্দ নয়, মাসে মোটামুটি পঁচাত্তর হাজার, সক্কলকে দিয়ে থুয়েও হাতে হাজার সাতেক। ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে ব্যবসাটা আর একটু বাড়ানোর কথা বলছে বাবা, অভিমন্যুর ভয় করে ব্যবসাটাই যদি তাকে শেষে গিলে খেয়ে নেয়!

বড় জারে বেশ কিছুটা তরল। বর্ণহীন। ঢাকা খুলে শুঁকল অভিমন্যু, গোবিন্দকে বলল,—এটা কবে বট্‌লিং করতে হবে মনে আছে তো?

—কাল। সাড়ে এগারোটার পর।

—হ্যাঁ। মনে করে আজ পাঁচ সিসি অ্যাসিটোফেনন মিশিয়ে দিস তো। অভিমন্যু কবজি উল্টে সময় দেখল,—এই ধর, অ্যারাউন্ড তিনটে। আমি যদি এসে পড়ি তো আমিই দেব।

—আচ্ছা।

—সিলিং হয়ে গেলে পারফিউম বক্সগুলো তৈরি করে ফেলিস। খুব সাবধানে, হ্যাঁ?

বলে অফিসে ফিরে এল অভিমন্যু। খাতাপত্রের কাজ করল কিছুক্ষণ। অ্যাকাউন্ট্সের কাজও সে নিজেই করে, শুধু বছরের শেষে সুপ্রিয়কে দিয়ে একবার পরীক্ষা করিয়ে নেয়। এবার একবার যাওয়া দরকার, ইয়ার এন্ডিং তো

ঘনিয়ে এল। সুপ্রিয়রা যেন কবে ফিরছে হানিমুন থেকে?

চড়াং করে মনে পড়ে গেল সেদিনের সেই পারফিউমটার কথা। নাকি সেই সুগন্ধী মেয়েটার কথা? সুপ্রিয়র বউভাতের দিন পারফিউমের নাম এনে দিয়েছিল তন্নিষ্ঠা। ফ্যান্সি মার্কেট থেকে কিনেও এনেছে অভিমন্যু। নামটা পিকিউলিয়ার। ডেড্‌লি। শুনলেই একটা ঘাতকের অনুভূতি আসে। কিন্তু ঘাতক কে? পারফিউমটা? না যে পারফিউমটা মেখেছিল, সে?

নিজের ভাবনায় নিজেই মজা পেল অভিমন্যু। তন্নিষ্ঠা কি সম্মোহিত করে দিল তাকে? ওরে নির্বোধ মায়া কাটা, দেরি হয়ে গেছে।

বেঁটে আলমারিটা খুলে অভিমন্যু পারফিউমের শিশিটা বের করল। মণিবন্ধে স্প্রে করল সুরভি। ঘ্রাণ নিচ্ছে। আশ্চর্য, গন্ধ তো সেদিনের মতো লাগে না!

কী কী আছে এতে? বের্গামট্ অয়েল বোঝাই যাচ্ছে, হালকা ইউক্যালিপটাসও টের পাওয়া যায়.....আর কী আছে? একটা ফুল ফুল গন্ধ আসে কেন? অচেনা ফুল? জুঁই ল্যাভেন্ডার গোলাপ বা রজনীগন্ধা নয়, তবে কি ইলাং-ইলাং? মাদাগাস্কারের ফুল ব্যবহার করেছে? ফিক্সেটিভ কী আছে? সিভেটোন কেন মনে হয় আজ? তাহলে তো এটা ফ্লোরাল! সেদিন কেন মনে হয়নি? কেন একটা অদ্ভুত পাতার গন্ধ পাচ্ছিল সে? কচি পাতা, একটু বুনো বুনো ধরনের! তার নাক এত ভুল করল সেদিন?

তন্নিষ্ঠারই কি নিজস্ব গন্ধ আছে কোনও?

আবার অভিমন্যু ধমকাল নিজেকে। ওরে নির্বোধ মায়া কাটা, তোর দেরি হয়ে গেছে।

একটা বাজল, সিলিং মেশিন বন্ধ হয়েছে। গোবিন্দ আর মালতী এবার টিফিন করবে।

অভিমন্যু উঠল। এ সময়টায় সে বাড়ি যায়। মা আজকাল আর তাড়াহুড়ো করে রান্না করতে পারে না, তাই দুপুরে বাড়ি এসে স্নানাহার সারে অভিমন্যু।

আজ আবিষ্টের মতো বাড়ি ফিরেছিল। বাথরুমে ঢুকেই মেজাজ খিঁচড়ে গেল। কলে জল নেই, চৌবাচ্চাতেও তলানি মতন পড়ে আছে।

অভিমন্যু গলা ওঠাল,—মা, জল নেই কেন?

উত্তর নেই।

—ওপরে বলে দাও পাম্প চালাতে।

এবারও উত্তর নেই।

অভিমন্যু ধন্দে পড়ে গেল। মা'ই তো দরজা খুলে দিল, গেল কোথায়? আর হাঁকডাক না করে তলানি কাচিয়ে কাচিয়ে কাকস্নান সারল অভিমন্যু। বেরিয়ে দেখল মা খাবার টেবিলেই বসে।

মার মুখে এত আঁধার কেন?

অভিমন্যু জিজ্ঞেস করল,—কী হয়েছে? শরীর খারাপ? সুপ্তোত্থিতের মতো নড়ে চড়ে উঠল সুরমা,—অ্যাঁ?

—বাথরুম একদম নির্জলা কেন আজ? আজও কি পাম্প গন্‌ ?

—হ্যাঁ।

ওফ, কী যে বাহানা শুরু করেছে বাড়িওলি! কত ভাবেই না জ্বালাচ্ছে! ওপর থেকে ময়লা ফেলছে, যখন তখন কটুকাটব্য করছে, ওঠানোর জন্য একেবারে মরিয়া। বিশ বছর অভিমন্যুরা আছে এ বাড়িতে, আড়াইশো টাকায় ঢুকেছিল, এখন সাড়ে বারোশো, তবুও আশ মেটে না। নতুন ভাড়াটে এলে দশ বিশ হাজার থোক মিলে যাবে, শুধু এই আশায়.....! গত বছর কী কাণ্ডটাই না করল! বাথরুমের অকহতব্য দশা, বাবা নিজে খরচা করে মিস্ত্রি লাগিয়েছে, ওমনি সবিতা মুখার্জি থানায়! তার বাড়ি নাকি ভাড়াটেরা ভেঙে ফেলছে! পুলিশ এল, পার্টির ছেলেরা হাজির—বিদিকিচ্ছিরি ব্যাপার। কেউ অবশ্য সেদিন ওই মহিলার পক্ষে যায়নি। ননীদা তো ভাল মতন ঝাড় দিয়েছিল সবিতা মুখার্জিকে। সম্প্রতি সবিতাদেবী নতুন ট্যাকটিকস নিয়েছেন। যখন তখন পাম্প বিকল! আরে, সারানোর পয়সা না থাকলে আমাদের বল্‌, নতুন কিনে লাগিয়ে দিচ্ছি। এতেই বুঝি সুখ! নিজে ভারী ডেকে জল নেব সেও ভি আচ্ছা, ভাড়াটেকে তো টাইট দেওয়া গেল!

ঘর থেকে চুল আঁচড়ে এসে অভিমন্যু দেখল তখনও সুরমা একই ভঙ্গিতে বসে। অভিমন্যু চোখ সরু করল,—কেসটা কী? ওপরের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে?

—না। সুরমার স্বর ঘড় ঘড় করে উঠল।

মার চোখ দুটো সামান্য ঘোলাটে লাগল অভিমন্যুর। কপালে হাত ছোঁওয়াল। নাহ্‌, টেম্পারেচার নরমাল। কী যেন সন্দেহ হল অভিমন্যুর, প্রশ্ন করল,—দাদার ওখান থেকে চিঠি এসেছে নাকি?

সুরমার মাথা অল্প দুলল,—হ্যাঁ।

ও, সেই কেস। মেন্টাল হোম তিন মাস অন্তর অন্তর রুটিন চিঠি পাঠায় বাড়িতে, দাদার অবস্থাটা জানিয়ে। চিঠিটা এলেই মার এই অবসাদ রোগ চাড়া দেয়। আগেও হত, তবে এতটা প্রকট ছিল না। এবার বোধহয় ডাক্তার দেখাতেই হবে।

অনেক বছর তো হয়ে গেল, এখনও যে কেন সইয়ে নিতে পারল না মা?

সুরমাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টায় স্বরে আদুরে ভাব আনল অভিমন্যু,—আমায় খেতে দেবে না মা? পেট জ্বলে যাচ্ছে।

—দিই।

—কী মেনু আজ?

সুরমা যেন কথাটা শুনতেই পেল না। খাবার রান্নাঘরে বাড়াই ছিল, এনে টেবিলে রেখে দিল। বড়ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল, অভিমন্যু পিছু ডাকল, —বাবাকে দেখছি না? শুয়েছে?

—না।

—বেরিয়েছে নাকি? কোথায় গেল এই রোদ্দুরে?

সুরমা হ্যাঁ না কিছুই বলল না, ঢুকে গেছে ঘরে।

খেতে খেতে ভাবছিল অভিমন্যু। বাবা কি আবার ডি আই অফিসে ছুটেছে আজ? নিশ্চয়ই তাই। মিনিংলেস। যতই নিজেকে শক্তপোক্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করুক, সাতষট্টি বছর বয়স হয়েছে, সেটা তো একবার ভাববে! পেনশানের কাগজপত্র তৈরি হয়নি, সার্ভিসবুকে গণ্ডগোল আছে......বুঝিয়ে দিলে অভিমন্যুই তো ছোটাছুটি করতে পারে। কে শোনে কার কথা! অভিমন্যুর দ্বারা নাকি এসব হবে না! বাবা এখনও তাকে ছোটছেলেটিই ভাবে। ঝানু অঙ্কের মাস্টার অহীন্দ্র মজুমদারের গণনায় নেই তার এই ছেলে এখন তিরিশ পুরে গেছে।

বেরনোর মুখে মার ঘরে একবার উঁকি দিল অভিমন্যু। শুয়ে আছে মা, দৃষ্টি কড়িকাঠে, নিষ্পলক। বাবার থেকে মা বছর দশেকের ছোট, এর মধ্যেই কী ভীষণ বুড়িয়ে গেল! চুল সাদা, কপালে বলিরেখা, গালের মাংসপেশি কুঁচকে গেছে, গলার চামড়া শিথিল.....!

একটা দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল অভিমন্যুর বুক থেকে। দাদা এ বাড়ির সকলের বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে। অভিমন্যুরও।

চার

—ওমা, ছোড়দি তুমি?

—চলে এলাম। নন্দিতা দরজা থেকেই ফ্ল্যাটের দেওয়ালে চোখ বোলালো,—তোদের রঙের কাজ কমপ্লিট?

—রান্নাঘর এখনও বাকি। শর্মিলা চকচকে চোখে ননদের দিকে তাকাল,—লিভিং রুমটা কেমন লাগছে গো? বেশি চড়া হয়ে গেছে কি?

—ভালই তো দেখাচ্ছে। ...এই পিংকটা প্রথম প্রথম একটু ডিপ থাকে, কটা দিন পরে নরম হয়ে যায়।

—কথাটা তোমার ভাইকে একটু বোলো তো। সারাক্ষণ চেঁচিয়ে যাচ্ছে ক্যাড ক্যাড ক্যাড...

নন্দিতা মুচকি হাসল। রন্টুর প্রিয় রং নীল, আর সব রংই তার চোখে বিশ্রী। সেই ছোটবেলা থেকেই। কতগুলো যে নীল জামা-প্যান্ট আছে রন্টুর! ডার্ক-ব্লু স্কাই-ব্লু রয়াল-ব্লু পিকক-ব্লু নেভি ব্লু টারকুইজ ব্লু...। দিদি বিয়ে হয়ে জামশেদপুর চলে যাওয়ার পর দিদির বাতিল একটা তুঁতে রং প্রিন্টেড শাড়ি কেটে রন্টু পাঞ্জাবি পর্যন্ত বানিয়েছিল। খ্যাপা নাম্বার ওয়ান।

চটি খুলতে খুলতে স্মিত মুখে নন্দিতা জিজ্ঞেস করল, —মা কোথায় রে?

—ঘরে। মেগায় বসেছে।

হুঁউ, মার ঘর থেকে টিভির আওয়াজ আসছে বটে। চোখা চোখা সংলাপ! ওই সিরিয়ালটা চলছে বোধহয়। পিতামাতা।

নন্দিতা নরম সোফায় শরীর ছেড়ে দিল,—তাহলে তো এখন ও ঘরে নো

এনট্রি।

—চা করি ছোড়দি?

—কর। বেশ কড়া করে। অফিসে মিটিং ছিল, ভ্যাজোর ভ্যাজোরে মাথা ধরে গেছে।

—সঙ্গে কী খাবে?

—কী খাওয়াবি?

শর্মিলা মাথা চুলকোল,—তুমি যদি ফোন করে দিতে আসবে, পিৎজা আনিয়ে রাখতাম। ...টুকুসটাও এই মাত্র কোচিং-এ বেরিয়ে গেল...

নন্দিতা মুখ টিপে হাসল, —ফরম্যালিটি করছিস কেন? ঘরে যা আছে তাই দে না।

—এহ্, খাটাখাট্নি করে আসা, শুধু রুটি চচ্চড়ি খাবে? রুটি একটু বাদাম তেলে ভেজে দিই?

বলেই রান্নাঘরে ছুটেছে শর্মিলা। ঘরে বসে থেকে খেয়ে শুয়ে ভালই মুটিয়েছে, তবে এই আটত্রিশেও বেশ তুরতুরিটি। একটু যেন বেশি আহ্লাদী আহ্লাদীও!

ঢাউস ভ্যানিটি ব্যাগখানা সোফায় রাখল নন্দিতা। লিভিংরুমটা বেশ অগোছালো আজ। সোফাগুলো স্বস্থানে নেই, বেতের গ্লাসটপ সেন্টার টেবিল টিভির ক্যাবিনেটের দিকে ঠেলা, শোকেসও বেঁকে-চুরে আছে, কোণের স্ট্যান্ডল্যাম্প প্রায় মধ্যিখানে, মোজাইক মেঝেয় ইতস্তত রঙের কুচি জমাট। দেখেই বোঝা যায় রাজসূয় যজ্ঞ চলছে ফ্ল্যাটে। প্রায় আড়াই বছর হল সেলিমপুরের এই ফ্ল্যাটে এসেছে রন্টুরা, বাবা মারা যাওয়ার মাস ছয় পর। বাবার খুব নিজস্ব বাড়িঘরের শখ ছিল, কিন্তু দেখে যেতে পারল না। এই দুঃখে ফ্ল্যাটে এসে ভারী বিমর্ষ ছিল রন্টু, প্রোমোটারের করে দেওয়া প্লাস্টার অফ প্যারিসের ওপর আর হাত লাগায়নি, রং করল এতদিন পর।

ভাবতে গিয়ে নন্দিতার বুকটা সামান্য ভারী হয়ে গেল। আজ রন্টুর এই রং ঝলমল ফ্ল্যাটখানা দেখলে কী খুশিই যে হত বাবা! নন্দিতাই যখন রানিকুঠিতে ফ্ল্যাট কিনল, বাবা কম আনন্দ পেয়েছিল! যাক, নিজে পারেনি, মেয়ে তো করল!

—কী রে, তুই কতক্ষণ?

আসছেন চিন্ময়ী। সত্তরে পৌঁছেও তাঁর হাঁটাচলা এখনও সাবলীল।

নন্দিতা হাল্কা হওয়ার চেষ্টা করল। ছদ্ম গাম্ভীর্য আনল গলায়,—বহুক্ষণ এসেছি, প্রায় ঘণ্টা খানেক। এবার চলে যাব।

পলকের জন্য যেন থমকালেন চিন্ময়ী। পরক্ষণে মেয়ের ঠাট্টাটা বুঝতে পেরেছেন,—যাহ্, মিথ্যে কথা বলিস না। আমি তো এইমাত্র এ ঘর থেকে গেলাম. ...আমার ঘরে যাসনি কেন?

—গিয়ে কী লাভ? মুখে তো কুলুপ এঁটে বসে থাকতে হত।

—যাহ্, তা কেন? টিভি দেখলে কি আমি কথা বলি না? চিন্ময়ী মেয়ের

পাশটিতে এসে বসলেন, দুঃখমাখা খুশি-খুশি গলায় বললেন,—যাই বল্, আজকেরটা কিন্তু জমেছিল খুব। লোকটা কী বজ্জাত কী বজ্জাত, বউকে কী কষ্টটাই না দিচ্ছে! ওই পাজির পাঝাড়াটাকে কেন যে পুলিশে ধরছে না!

—বোধহয় তোমার মেগা শেষ হয়ে যাবে, সেই ভয়ে। নন্দিতা আবার পল্‌কা টিপ্পনী কাটল। লঘু গলাতেই বলল, —তুমি ওই আদ্যিকালের সাদাকালোটায় দ্যাখো কেন? রন্টু এত বড় একটা কালার টিভি কিনল...

—না বাবা, আমার সাদাকালোই ভাল। ওসব রঙিন-টঙিন তোমাদের জন্য। শর্মিলা খাবার নিয়ে এসেছে। প্লেট রাখতে-রাখতে বলল, —সত্যি কথাটা বলুন না মা, নাতির সঙ্গে রোজ আপনার লড়াই বাধছিল, তাই...। জানো তো ছোড়দি, টুকুস বাংলা দেখবে না, মাও বাংলা ছাড়া দেখবেন না, এই নিয়ে জোর কাজিয়া। মা রেগেমেগে রঙিনটা বয়কট করেছেন।

—হ্যাঁ বাপু হ্যাঁ, আমার সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

শর্মিলা হাসতে হাসতে চা আনতে চলে গেল।

নন্দিতা প্লেট টানল। রুটি নয়, পরোটা ভেজে দিয়েছে শর্মিলা। ছিঁড়ে মুখে দিতে গিয়েও নন্দিতা থেমেছে। শর্মিলা ফিরে আসার আগেই কাজের কথাটা সেরে নেওয়া ভাল।

চিন্ময়ীর পাশে একটু সরে গিয়ে চাপা গলায় নন্দিতা বলল, —তোমার সেই নেকলেসটা কোথায় মা? সেই কাঠি কাঠি?

—ও তো আমি শর্মিলাকে দিয়ে দিয়েছি। চিন্ময়ীর নির্লিপ্ত জবাব।

—দিয়েই দিয়েছ?

—হ্যাঁ, ও বলছিল ওর খুব পছন্দ...। কেন রে?

নন্দিতা মনে মনে একটু দমে গেল। ক্ষীণ আশা ছিল, হারটা তিন্নিকে দেবে মা...। শর্মিলা কি আন্দাজ করেই ভালমানুষ মাকে জপিয়ে জাপিয়ে অত সুন্দর নেকলেসটা বাগিয়ে নিল?

নীরস গলায় নন্দিতা বলল, —না, ভাবছিলাম ওটা ক'দিনের জন্য একটু নিয়ে যাব।

শর্মিলা চা নিয়ে পৌঁছে গেছে। জিজ্ঞেস করল, —কী নিয়ে যাবে গো ছোড়দি?

—ওই মা'র কাঠি কাঠি হারটা।

—কেন গো?

নেকু! নন্দিতা বিরক্তি চেপে হাসল, —ডিজাইনটা তিন্নির খুব পছন্দ, ভাবছিলাম স্যাকরাকে দেখিয়ে অবিকল ওরকম একটা গড়িয়ে নেব।

—খুব মানাবে তিন্নিকে। শর্মিলা গুছিয়ে বসল, —তোমার আর সব গয়না গড়ানো কমপ্লিট?

—কই আর! বানাতে দিচ্ছিলাম, তখনই তো শৌনকের দাদু...। ভালই হয়েছে, এক বছর সময় পেলাম, ধীরেসুস্থে করতে পারছি।

—তিন্নির কপালটা খুব ভাল। ওরকম একটা ছেলে আজকালকার দিনে...ইঞ্জিনিয়ার এম বি এ একসঙ্গে! তিরিশ পুরতে-না-পুরতে বিশ হাজার টাকা মাইনে...ভাবা যায়!

চিন্ময়ী বলে উঠলেন, —পরিবারটার কথাও বলো। বাবা অত বড় ডাক্তার, কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার নেই। মা'টিরও কী মধুর ব্যবহার! প্রথম আলাপেই দুটিতে আমায় ঢিপঢিপ প্রণাম করল।

নন্দিতার নেকলেসের শোক স্তিমিত হয়ে এল। খাচ্ছে। আলুচচ্চড়ি থেকে কাঁচালঙ্কা বার করে কুটুস কামড় দিল। যে কথা লক্ষ বার বলেও তৃপ্তি হয় না, সেই কথাই শুরু করেছে আবার। গরবিনী মুখে বলল, —এরকম একটা কোহিনূর কে ঢুঁড়ে বার করেছে সেটা বলো? এসেছে তো কত সম্বন্ধ, কত লোক তো এনেছিল, দৌড় তো এই ব্যাঙ্কের ক্লার্ক, কি গভর্নমেন্টের অফিসার, মেরে কেটে প্রফেসর। ভাগ্যিস আমি ঠিক করে রেখেছিলাম খুব ব্রাইট ফিউচার না হলে কিছুতেই সেখানে এগোব না!

কথাটায় চোরা ঠেস আছে। শর্মিলার মা একবার একটা সম্বন্ধর কথা বলেছিলেন। পাত্র অধ্যাপক।

শর্মিলার মুখে হালকা ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল। হাসিটা ধরে রেখেই উঠে দাঁড়িয়েছে, —তোমরা মা মেয়ে তাহলে কথা বলো ছোড়দি, আমি ততক্ষণ বালিশের ওয়াড়গুলো পরিয়ে ফেলি।...যাওয়ার সময়ে কিন্তু মনে করে আমার নেকলেসটা নিয়ে যেও।

নন্দিতা একটু গোমড়া হয়ে গেল।

ননদ-ভাজের সূক্ষ্ম লুকোচুরি খেলাটা চিন্ময়ী ধরতেই পারেননি। হাসি হাসি মুখে বললেন, —হ্যাঁ রে, শৌনকের সঙ্গে তিন্নির দেখা হয়?

—খুব হয়। নন্দিতা ঝলক তাকিয়ে নিল শর্মিলার গমনপথের দিকে। বলল, —দুজনে কী ভাব! এই তো শৌনক কবে যেন ফোন করল, সেজেগুজে নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল তিন্নি, ফিরল সেই রাত দশটায়। সিনেমা দেখে, বাইরে খেয়ে...শৌনকই পৌঁছে দিয়ে গেল। মোটরবাইকে।

—বাহ্ বাহ্। চিন্ময়ীর গোলগাল মুখখানা হাসিতে ভরে গেছে। ভুরু নাচিয়ে বললেন, —আর তোরা? তোরা তোদের কর্তব্য করছিস তো। হবু বেয়াই-বেয়ানের সঙ্গে যোগাযোগটা রাখছিস?

—আমার একার পক্ষে যতটা সম্ভব। প্রায় রোজই একবার বীথিকাদির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলি, অফিসফেরতা ওবাড়িতে গেছিও দু-একদিন। লাস্ট বুধবার শৌনকের দাদুর ষাণ্মাসিক কাজ ছিল...তোমার জামাই-এর তো কর্তব্যজ্ঞানও নেই, দায়িত্ববোধও নেই...জন্মের মধ্যে কর্ম, একবারই তিনি গিয়েছিলেন, সেই শৌনকের দাদু মারা যাওয়ার দিন...! মনের ক্ষোভ দমকে দমকে বেরিয়ে এল নন্দিতার, —অগত্যা আমিই ওদিন অফিস কামাই করে ছুটলাম।

—ওরকম করে বলছিস কেন? নিশ্চয়ই শুভেন্দুর কোনও কাজ ছিল।

—হ্যাঁ, তিনি তো পৃথিবীর ব্যস্ততম মানুষ। এত ব্যস্ত যে কোনও দায়িত্বই পালন করার তার সময় হয় না। মেয়েকে আলগা সোহাগ দেখানো পর্যন্ত ঠিক আছে। তিন্নিকে বড় করার সমস্ত ঝক্কিটা পোহাল কে? নন্দিতা ঝেঁঝে উঠল, —মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করা, কলেজের অ্যাডমিশান, মাস্টার খোঁজা...। এই, বিয়ের গোটা মার্কেটিং তুলছে কে? বাজারহাট করো, সেও আমি, ফার্নিচার পছন্দ করো, সেও আমি, নেমন্তন্ন লিস্টটাও আমাকেই একা বসে করতে হবে,...। তিনি বসে বসে ল্যাজ নাড়বেন।

—ও কী ভাষা নন্দু? চিন্ময়ী প্রতিবাদ করে উঠলেন, —সেও তো করে। এই তো কবে যেন ফোনে কথা হচ্ছিল, ও বলল কোন এক বন্ধুকে বলে রেখেছে...তারা নাকি খুব বড় ক্যাটারার...। তুই বাপু শুভেন্দুর একটু বেশিই নিন্দে করিস।

নন্দিতার ঝাং করে মাথা গরম হয়ে গেল। সামান্য একটা কাজ মাথায় নিয়েছে কি নেয়নি, আদৌ কী করবে জানা নেই, সাত-আট মাস আগে থেকে ঢেঁড়া পেটানো শুরু করে দিয়েছে। মা'ও যেন কেমন হয়ে গেছে আজকাল, শুভেন্দুর নামে কিছু বললেই গায়ে এমন ফোস্‌কা পড়ে। অথচ এই মা নিজের চোখে দেখেছে এক সময়ে ওই মানুষটাকে নিয়ে অহর্নিশি কী মানসিক যন্ত্রণায় ভুগেছে নন্দিতা। তখন তো মা শুভেন্দুর ওপর খড়্গহস্ত ছিল, বাবা জামাই-এর হয়ে একটি কথা বললেও মা'র কী বিরক্তি। পরে যখন মোটামুটি মিটমাট হয়ে গেল, মুখে মা এসো বোসো করত বটে, কিন্তু কোনওদিনই জামাই তার তেমন পেয়ারের হয়ে ওঠেনি। বাবা মারা যাওয়ার আগে কদিন লোকদেখানো ডাক্তার হাসপাতাল করল, অমনই চিন্ময়ীদেবী গলে জল! ওফ্, নাটুকে লোকটা অভিনয় জানেও বটে, ঠিক বুঝেছে কোন সিনে ক্ল্যাপ পাবে।

চিন্ময়ীকে মুখে কিছু বলল না নন্দিতা, এই বয়সে পৌঁছে আর ভালওলাগে না। তবু একবার মনে হল মাকে নতুন খবরটা শুনিয়ে দেয়। শুভেন্দু অফিস থেকে বাতিল এখন, বোঝা আরও দ্বিগুণ হচ্ছে নন্দিতার! কে জানে তাতে মা'র দরদ হয়তো উথলে উঠবে, মেজাজ ঠিক রাখা আরও কঠিন তখন।

রন্টু টুকুসের জন্য আর অপেক্ষা করল না নন্দিতা, দুটো চারটে কথা বলে মিনিট দশেক পর উঠে পড়েছে। সেলিমপুর বাসস্ট্যান্ডে এসে ট্যাক্সি ধরল একটা। জানলা দিয়ে ঢুকছে ফুরফুর করে হাওয়া, চৈত্রের শুরুতে সান্ধ্য বাতাস এখন ভারী মোলায়েম, এতক্ষণ পর শ্রান্তি যেন দখল নিচ্ছে শরীরের, চোখ বুজে এল। মার কথাগুলো বাজছে কানে, অবিরাম নেহাই পড়ছে বুকে।

......তুই বাপু শুভেন্দুর একটু বেশিই নিন্দে করিস....

নিন্দে? ওই মানুষ কি নিন্দেমন্দর যোগ্য?

কত ছবি, কত টুকরো টুকরো ছবি....। কোনওটা বিবর্ণ, কোনওটা ঝাপসা, কোনওটা বা চোখ ঝলসে দেয়। আবার কোনও ছবি গুহাচিত্রের মতো হৃদয়ে

প্রোথিত, কোটি বছর পরেও বুঝি তা মুছবে না।

নাহ্, একটা ছবিও নন্দিতা মনে আনবে না। কেন সেধে সেধে কষ্ট পাবে?

একটা মাত্র ভুল গোটা জীবনটাকে ছারখার করে দিল? কী দেখে নন্দিতা লোকটার প্রেমে পড়েছিল? রূপ? সুন্দর কথা বলার ক্ষমতা? নাটকসর্বস্ব মানুষটার নাটকে ভুলেছিল? এক আদ্যন্ত উচ্চাশাহীন পুরুষ, আঠাশ বছর আগে অ্যাকাউন্টস্ ক্লার্ক হয়ে জীবন শুরু, কেরানি অবস্থাতেই পূর্ণচ্ছেদ। অফিসে বসে নাটক লিখছে, দুমদাম অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এতদিন মালিক সহ্য করেছে এই না ঢের। অথচ ইচ্ছে থাকলে কি উন্নতি করতে পারত না? নন্দিতার মতো লেখাপড়ায় অতি সাধারণ একটা মেয়ে যদি শুধু পরিশ্রমের জোরে তিন ধাপ উঁচুতে উঠতে পারে, আজ নয় নয় করেও তার মাইনে তেরো হাজার নশো তেতাল্লিশ, সেখানে শুভেন্দুর মতো চালাকচতুর লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট ছেলে কোথায় না পৌঁছতে পারত। নাটকই বা কী দিল শুভেন্দুকে? না যশ, না অর্থ। সেখানেও তো সে এক কেরানিই, বাসবেন্দ্র বসুরায়ের স্যাটেলাইট। একটা সামান্য ফ্ল্যাট করবে, মাথা গোজার ঠাঁই, তাতেও ওই লোকটা কখনও....? গর্ব করা হয়তো ভাল নয়, তবু এ কথা তো নিখাদ সত্যি, সংসারে যেটুকু স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে, সবই নন্দিতার পয়সায়। নন্দিতার রক্ত জল করা খাটুনির বিনিময়ে। ফ্ল্যাট ফ্রিজ টিভি ওয়াশিংমেশিন দামি দামি আসবাব—কে কিনেছে? তার পরও শুনতে হয় তুই বাপু শুভেন্দুর একটু বেশিই নিন্দে করিস!

বিয়েটা টিকিয়ে রাখাই কি ভুল হয়েছিল? বিয়ে ভেঙে চলে এলে হয়তো এই আফসোসটা থাকত না! অহরহ হুল বিঁধত না বুকে!

অবশ্য সম্পর্কের আর আছেই বা কী? এক বিছানায় পাশাপাশি দুটো কফিন হয়ে শুয়ে থাকা ছাড়া? হয় বরফ, নয় আগুন, এ ছাড়া আর কী টিকে আছে তাদের মধ্যে?

তুষের আগুন বুকে নিয়ে ফ্ল্যাটের দরজায় বেল বাজিয়েছিল নন্দিতা, ভেতরে ঢুকেই হৃদয় জুড়িয়ে গেল। সোফায় কে ও, শৌনক না!

বিগলিত গলায় নন্দিতা বলল, —তুমি কতক্ষণ?

—এই তো, অফিস থেকে।

—তিন্নি, ওকে খাইয়েছিস কিছু?

—সব হয়ে গেছে, আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না।

নন্দিতা কয়েক পা এগিয়ে এল। এত কাছে নয়, যে শৌনক তাকে বেশি গায়ে পড়া ভাবে। আবার এত দূরেও নয়, যাতে গলা তুলে কথা বলতে হয়। বিয়ের আগে থেকেই শাশুড়ি সম্পর্কে শৌনকের যেন একটা সম্ভ্রম জাগে।

স্বরে স্নিগ্ধতা এনে বলল, —তোমরা দুজনে ঘরে বসে আছ কেন? এমন সুন্দর সন্ধে, বাইরে চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে....

—আমি তো কখন থেকে এই কথাটাই বলছি তন্নিষ্ঠাকে। শৌনক কথাটা টেনে নিল, —বললাম, চলো গঙ্গার পাড়ে একটা রাইড দিয়ে আসি, কতদিন

স্কুপে আইসক্রিম খাইনি....

—সত্যিই তো। যাচ্ছিস না কেন?

তন্নিষ্ঠা শরীর মুচড়োল, —আমার ভাল্লাগছে না মা। এমন দিনে ঘরেই বা খারাপ কী?

—যা খুশি কর বাবা।

নন্দিতা ভেতরে এল। তাদের এই ফ্ল্যাটের ড্রয়িং ডাইনিংয়ের জায়গাটা মোটামুটি মন্দ নয়। এল্ টাইপ। এই শেপই নন্দিতার পছন্দ, এতে খাওয়ার জায়গার প্রাইভেসিটা বজায় থাকে। শোওয়ার ঘর দুটোও মোটামুটি চলনসই। দুটো বাথরুম আছে ফ্ল্যাটটায়, একটা মনোরম পুবমুখো ব্যালকনি। সব মিলিয়ে ফ্ল্যাটটা নন্দিতার পরিবারের জন্য যথেষ্ট। নন্দিতার অবশ্য একটা সূক্ষ্ম বেদনা আছে। এই ফ্ল্যাটটা আটশো দশ স্কোয়্যার ফিট, রন্টুদেরটা আটশো চল্লিশ, শর্মিলা বলে সাড়ে আটশো। এইটুকু তফাতে কিছুই আসে যায় না, তবু....।

ঘরে ঢুকে নন্দিতার কপাল কুঁচকে গেল। শুভেন্দু চেয়ার টেবিলে বসে কী সব ছাইপাঁশ লিখছে। মগ্ন ভঙ্গি, হাতে সিগারেট। পাশে দুখানা মোটা মোটা ডিকশনারি।

একদম টেবিলের কাছটিতে এসে নন্দিতা বলল, —তুমি এখানে বসে? ছেলেটাকে একটু অ্যাটেন্ড্ করছ না?

শুভেন্দু মাথা না তুলেই বলল, —ওরা দুজনে কথা বলছে, ওখানে আমি গিয়ে কী করব?

—সে বুদ্ধি ঘটে থাকলে তুমি তো তুমি হতে না।....ছেলেটাকে কী খাইয়েছ শুনি?

—কী খাওয়াব? ও ছেলে তো চা কফি কিছুই খায় না। তাও আমি তো জোর করে সিঙাড়া রসগোল্লা নিয়ে এলাম।

নন্দিতা মরমে মরে গেল, —সিঙাড়া! তুমি ওকে শুধু সিঙাড়া খাইয়েছ?

—সঙ্গে রসগোল্লাও দিয়েছি। শুভেন্দু নিরুত্তাপ, —তোমার সিঙাড়া রসগোল্লা টেবিলে রাখা আছে।

—নিকুচি করেছে। উত্তরোত্তর মেজাজ চড়ছিল নন্দিতার, অনেক কষ্টে স্বর নামিয়ে রাখছে, —রোল প্যাটিস্ কিছু এনে দিতে পারোনি?

—প্যাটিস ফিনিশড্। আর ঝন্টুর দোকানের রোল ইচ্ছে করেই আনিনি, ব্যাটা কীসের না কীসের মাংস দেয়! শুভেন্দু লেখা থামিয়ে নন্দিতার দিকে তাকিয়েছে। একটু হেসে বলল, —অত কিন্তু কিন্তু করছ কেন? ও তো আজ বাদে কাল বাড়ির লোকই হয়ে যাচ্ছে....। আমি তো ওকে সিগারেটও অফার করতাম, সেটাও তো খায় না!

ঠিকঠাক জবাব আসছিল না নন্দিতার ঠোঁটে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, —সবাই তো আর তোমার মতো নেশাড়ু নয়। সিগারেট চা, শ্রাদ্ধের নাটক....

—আবার নাটক নিয়ে পড়লে কেন? শুভেন্দুর স্বরে কৌতুকের ভাব উবে

গেছে, —যাও না, ও ঘরে তোমার জামাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে বসে থাকো।

এই হচ্ছে ভাষা! টেপ করে রাখলে নন্দিতা গোটা বিশ্বকে শুনিয়ে দিতে পারে শুভেন্দু কত সুসভ্য ভদ্রলোক। মুখোশটাই দেখে সবাই, মুখটা চেনে না।

আহত ফণিনীর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ শ্বাস ফেলল নন্দিতা, তারপর বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। ঈষৎ ফাঁক হয়ে যাওয়া পর্দা সুচারুভাবে টান করে দিল। চেষ্টাকৃত মন্থর পায়ে ড্রয়িংরুমে এসেছে। অফিসের কী এক গল্প করছে শৌনক, বলতে বলতে হাসছে, ভ্রূভঙ্গি করে শুনছে তন্নিষ্ঠা।

কাহিনী শেষ করে শৌনক নন্দিতার দিকে ফিরল। সহজ গলায় বলল, —আপনাকে আজ খুব টায়ার্ড লাগছে?

—হ্যাঁ, ইয়ার এন্ডিংয়ের মুখ....। নন্দিতা মাথা দোলাল, —বীথিকাদির কী খবর?

—মা তোফা আছে। খুব ডিউটি করে বেড়াচ্ছে।

—সেই ওল্ডএজ হোম? বীথিকাদির সোশাল ওয়ার্ক?

—হ্যাঁ, সোশাল ওয়ার্ক বলতে পারেন। শৌনক কাঁধ নাচাল, —ওল্ডএজ হোম বললেও কিছু ভুল হয় না....

এই হচ্ছে অন্তঃকরণ। অর্থবান ডাক্তারগৃহিণী হয়েও কাজের মধ্যে ডুবে থাকে বীথিকাদি, কাজ খুঁজে নিয়ে ডুবে থাকে। শর্মিলাদের মতো শুধু বরেরটি খেয়ে শুয়ে বসে মোটায় না।

সপ্রশংস চোখে নন্দিতা বলল, —বীথিকাদিকে দেখে আমার ভারী শ্রদ্ধা হয়। আজ কোন হোমে গেছেন বীথিকাদি?

—মাসি মেসোর হোম।

নন্দিতার বোধগম্য হল না, —সেটা কোথায়?

—সল্ট লেকে। মাসি মেসো মানে আমার মা'র মাসি মেসো। মেসো, আই মিন আমার দাদু হাইকোর্টের জাজ্ ছিলেন। নামও বোধহয় শুনে থাকবেন। জাস্টিস দেবেন্দ্রবিজয় গুহ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি যেন। নন্দিতা ঝপ করে মাথা নেড়ে দিল।

—দাদুর এখন একটু ডাউন ফেজ্। গত মাসে ছোট একটা স্ট্রোক হয়েছিল, এখন সামলেছেন মোটামুটি, তবে তাঁর দেখভাল করা....। আমার মাসিদিদু আবার অ্যাকিউট হাঁপানির পেশেন্ট....

—ছেলেমেয়েরা কোথায়?

—ছেলে একটিই। রমেন মামা। তিনি আছেন ভ্যাঙ্কুভারে। ওখানেই সেটলড্।

—আহা রে, দাদু দিদার তো তাহলে এখন খুব কষ্ট?

—কষ্ট বলে কষ্ট? সাফারিংস্ ডিউ টু ওল্ড এজ। থাউজেন্ডস্ অব কমপ্লিকেশানস্। শরীর চলে তো মন অচল, মন তাজা থাকলে শরীর বিগড়োয়।

বেচারাদের কেউ নেই দেখাশুনো করার। মার মনটা একটু বেশি সফ্‌ট, তাই মা'ই ছুটছে।

তন্নিষ্ঠা ফস করে প্রশ্ন করে বসল, —অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট ইওর রমেন মামা? তিনি বাবা মার জন্য কী করছেন?

—টেলিফোনে খবর নেয়। রেগুলার ডলার পাঠায়। দাদুমেসোও অবশ্য সলিড পার্টি....

—শুধু ডলার আর টাকাতেই কি বার্ধক্যের একাকিত্ব ঘোচে?

—হোয়াট এলস্‌ হি ক্যান ডু? এটা নিশ্চয়ই আশা করা লজিকাল হবে না, তিনি অ্যাট হিজ প্রাইম এজ অব ফরটিসিক্স তাঁর এসট্যাব্‌লিশড্‌ ক্যারিয়ার ছুড়ে ফেলে পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে ফিরে আসবেন? দ্যাট টুউ, সেই বাবা মার জন্য, যাঁরা আর কদিন বাঁচবেন তার সার্টেন্‌টি নেই?

পলকের জন্য নন্দিতার বুক হিম। কল্পচোখে নিজের বার্ধক্য দেখতে পেল যেন! পরক্ষণেই অনাগত ভবিষ্যতের উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলেছে। ঠিকই তো, কেরিয়ার গড়তে গেলে মানুষকে কিছুটা নিরাবেগ তো হতেই হয়। হয়তো বা নিষ্ঠুরও। দেশে থেকেই বা কটা ছেলেমেয়ে বাবা মাকে দেখে? সন্তানকে মানুষ করে দিয়েছি বলে সন্তানও বাবা-মার কাছে চিরতরে দায়বদ্ধ হয়ে গেল, ও ভাবনারও বোধহয় কোনও মানে হয় না।

তন্নিষ্ঠাটা তবু তর্ক করে চলেছে,—আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না শৌনক। আমার মনে হয় প্রতিটি ছেলেমেয়ের, বাবা মা, বা বলতে পারো তার প্রতিপালকদের প্রতি একটা কর্তব্য থাকা উচিত। অন্তত হোয়েন দে আর ইন ওলড্‌ এজ। মানে অসহায়।

—এটা ডিবেটেবল্‌ সাবজেক্ট। বুড়ো হলেই মানুষ নিজেকে অসহায় ভাববে কেন? মনের একাকিত্ব ঘোচানোর এক হাজার একটা রাস্তা আছে। চিনে তো বুড়োরা নিজেদের এনগেজড্‌ রাখার জন্য কমিউনিটি সার্ভিস করে। নিজেকে বুড়ো না ভাবলেই ল্যাটা চুকে যায়। এখন, সেকেন্ড পয়েন্ট আসছে, ফিজিকাল অসহায়তা। হ্যাঁ, এই প্রবলেমটা আসতেই পারে ..... শরীরের নরমাল ওয়্যার অ্যান্ড টেয়ার।......এবং ছেলেমেয়েদের তখন ফাংশানটা কী? নিতান্ত অমানবিক না হলে তারা অবশ্যই ভাববে, করবে, বাট উইদিন দেয়ার ওউন লিমিটেশানস্‌। পৃথিবীটা যেমন তার বাবা মার, তেমনি তারও তো বটে। সেখানে তার কিছু হোপস্‌ অ্যান্ড ড্রিমস্‌ আছে। তার কিছু প্রমাণ করার আছে, অ্যাচিভ করার আছে, এগুলো ভুলে গেলে চলবে কেন? জীবনের তিনটে স্টেজ আছে। আমি বড় হচ্ছি, আমি অ্যাচিভ করছি, আমি ফুরিয়ে যাচ্ছি। আমার বাবা মা ফুরিয়ে যাচ্ছে বলে আমি চাকরি বাকরি সব ছেড়ে সারাক্ষণ তাদের পাশে গালে হাত দিয়ে বসে রইলাম, এতে কি পৃথিবী এক চুল এগোবে?

—অর্থাৎ পৃথিবীকে এগোনোর জন্য সেন্টিমেন্ট ইমোশান্‌স্‌ সব মুছে ফ্যালো। তাই তো? তন্নিষ্ঠা তবু বেঁকে আছে।

—ছেলেমেয়েরা বাবা মাকে ভালবাসবে না, তাদের সেন্টিমেন্ট ইমোশানস্ থাকবে না, এ কথা আমি কখন বললাম? ফর এগ্‌জামপ্‌ল্ বলি, আমার বাবার প্রেশার আছে, জানোই বোধহয় মার সুগার লেভেলও একটু হাই। কিন্তু তা বলে আমি যদি আজ কলকাতার বাইরে একটা অফার পাই, বাবা মার কী হবে ভেবে আমায় সেটা স্যাক্রিফাইস করতে হবে? আর যদি যাই, তাহলেই কি ধরে নেওয়া হবে আমি বাবা মাকে ভালবাসি না?

শৌনকের যুক্তিজালে ক্রমশ আচ্ছন্ন নন্দিতা। তার বিতর্ক প্রতিভা দেখে বিমুগ্ধও। তার মধ্যেও শৌনকের কথায় কী যেন ইঙ্গিত পেয়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করল, —তুমি বাইরে কি কোনও অফার পেয়েছ?

—নট টিল নাউ। অ্যাপ্লাই করেছি অনেক, অল্প স্বল্প রেসপনস্ আসতে শুরু করেছে।

—কোন সাইডে তোমার যাওয়ার ইচ্ছে?

—চয়েস নেই। ওয়েস্ট নর্থ সাউথ যে কোনও সাইড। এখানেও যদি বেটার চান্স পাই, এখানেও থেকে যেতে পারি। শৌনক নরম করে হাসল,—যেখানে আমি বেশি দাম পাব, আই শ্যাল বিলঙ্ টু দ্যাট প্লেস।

—অর্থাৎ ইউ ওয়ান্ট টু বি সোল্ড্!

—হোয়াই নট ....

শৌনক আর তন্নিষ্ঠায় আবার তর্ক বেধেছে। চলছে। আর একটুক্ষণ বসে থেকে ঘরে এল নন্দিতা, অ্যাটাচড্ বাথরুমে ঢুকেছে। শাওয়ার খুলে স্নান করল ভাল করে। বেরিয়ে দেখল গভীর মনোযোগে অভিধান উল্টোচ্ছে শুভেন্দু। ফর ফর ফর ফর করে অনেকগুলো পাতা উল্টে গেল। শব্দ খুঁজছে। নাটকের অনুবাদ চলছে নির্ঘাত। খেটে খুটে করে দেবে, বাসবেন্দ্র বসুরায় সেটি লুফে নিয়ে মঞ্চস্থ করবে, এক পয়সা পারিশ্রমিক জুটবে না ..... একেই বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। হুঁহ্।

শৌনক কখন যেন চলে গেছে। তন্নিষ্ঠাও মনে হয় নিজের ঘরে। নন্দিতা অন্ধকার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। কম্পাউন্ডের গেটের ধারে রাধাচূড়া গাছটা ছেয়ে গেছে ফুলে, তিনতলা থেকে দেখছে নন্দিতা। তিন্নি আর শৌনক মিলবে বেশ, দুজনেই খুব তর্কবাগীশ। তবে সব সময়ে তর্ক করাটাও ভাল নয়, শেখাতে হবে তিন্নিকে।

—মা?

মেয়ের ডাকে ফিরে তাকাল নন্দিতা। কখন যেন চুপিসাড়ে তন্নিষ্ঠা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে কেমন মেঘের আভাস, এই বসন্তেও।

নন্দিতা কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করল, —কী রে তিন্নি?

—আমি বিয়ে করব না মা।

—সে কী রে? কেন?

—আমার তোমাদের ছেড়ে থাকতে ভাল লাগবে না।

—দূর পাগলি, বিয়ের পর দেখবি উল্টো হয়ে গেছে। আমাদের কাছে এসে দুদিন থাকলেই তখন হাঁপিয়ে উঠবি।

—আমায় ছেড়ে তোমরা থাকতে পারবে তো মা? তুমি? বাবা?

হঠাৎ কথাটা যেন অন্য রকম ভাবে প্রবেশ করল নন্দিতার কানে। যেন নন্দিতা শুনল, আমি ছাড়া তোমরা থাকতে পারবে তো মা?

সত্যি তো, মেয়ে চলে গেলে তার আর শুভেন্দুর মাঝের সেতুটাও তো মিলিয়ে যাবে। তখন তারা পাশাপাশি থাকবে কী করে?

নন্দিতা ভেতর থেকে কেঁপে উঠল।

পাঁচ

প্রকাণ্ড ক্লাসরুমের বেঞ্চি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আজ। তাদের স্থান নিয়েছে গোটা আষ্টেক বড়সড় টেবিল। কোনও টেবিলে আকর্ষণীয় বৈজ্ঞানিক মডেল, কোথাও চলছে বিজ্ঞানের খেলা। প্রতিটি মডেল সযত্নে বানানো। আগ্নেয়গিরির খুদে প্রতিরূপ, বিভিন্ন জটিল যৌগের পারমাণবিক গঠনপ্রণালী, নক্ষত্রের জন্ম মৃত্যু, সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ .....। খেলাগুলোও বেশ মজাদার। কংকাল ভকভক সিগারেট টানছে, বরফ ঘষে আগুন জ্বালানো হচ্ছে কাঠে, গপাগপ চলছে আগুনখাওয়া .....। দেখাচ্ছে কয়েকজন সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ ছেলেমেয়ে, মডেলগুলোর ব্যাখ্যা করতেও তাদের বিপুল উৎসাহ।

ঘরে অবশ্য দর্শক তেমন একটা বেশি নেই। মাঝে মাঝে অলস মেজাজে ঢুকছে কিছু তরুণ তরুণী, এক আধ জন বয়স্ক মানুষও পা রাখছে কখনও সখনও, ব্যস। এক একটা টেবিলের সামনে থমকে দাঁড়াচ্ছে তারা, দেখছে, শুনছে, বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে কারুরই বিশেষ মন নেই, একটু পরেই অডিটোরিয়ামে গানবাজনার আসর বসবে, সেদিকেই সকলের এখন আগ্রহ বেশি।

ঘরের এক পাশে ডায়াস। হঠাৎ এক দাড়িঅলা যুবক আবির্ভূত হল সেখানে, উচ্চঃস্বরে হাঁক পাড়তে শুরু করল, —আসুন আসুন, দেখে যান দেখে যান, গণেশবাবাজির খেল্ দেখে যান, জয় হনুমানজীর খেল্ দেখে যান ..... আমার বাচ্চা ইঁদুরের খেলা দেখে যান.......।

বলতে বলতেই কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে গোটা কয়েক মূর্তি বার করে ফেলেছে যুবক। পটাপট টেবিলে সাজিয়ে ফেলল। খেলা দেখানো বন্ধ করে ছুটে এল এক কিশোরী, একটা দুধের ক্যান ধরিয়ে দিল যুবকের হাতে, সঙ্গে মধুপর্কের বাটি। যুবকের আহ্বানেই হোক, কি কৌতূহলেই হোক, বেশ কিছুটা সাড়া জেগেছে। ডায়াসের সামনে এখন ছোট্ট ভিড়। তিন মূর্তিকে দুধ খাওয়াতে শুরু করল যুবক। গণেশের শুঁড়ের মুখে দুধের বাটি ধরল, সুড়ুৎ দুধ সাবাড়। এবার হনুমান খাচ্ছে, তার পর ইঁদুর ....।

সঙ্গে সঙ্গে চলছে যুবকের গলা। কখনও চড়ায় উঠছে, কখনও খাদে নামছে, লাগ বাবা লাগ্, ভেল্‌কি লাগ্ ..... মাদারিকা খেল্ দেখো, আমার জব্বর ভেল্‌কি দেখো .... এমন খেলা আর পাবে না, দিয়ে যাও সব চার আনা চার আনা ..... !

ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে তন্নিষ্ঠা বড় বড় চোখে অভিমন্যুকে দেখছিল। কী আমূল বদলে গেছে ছেলেটা! সত্যি যেন এক ম্যাজিশিয়ান! এতটুকু জড়তা নেই, মুখ চলছে, হাত চলছে, সেদিনের সেই শান্ত শান্ত ভঙ্গি পুরোপুরি উধাও!

খেলা দেখানো শেষ। ঋজু স্বরে এবার দুধপানের রহস্য বোঝাতে শুরু করেছে অভিমন্যু। বৈজ্ঞানিক কারণ ব্যাখ্যা করছে প্রাঞ্জল ভাষায়। ক্ষণপূর্বের খ্যাপামির আর কণামাত্র চিহ্ন নেই।

বহুরূপী নাকি?

তন্নিষ্ঠার পাশটিতে একদা কলেজসহপাঠী শ্রেয়সী। চোখ ঘুরিয়ে শ্রেয়সী বলল, —এ নির্ঘাৎ কোনও কলেজের কচি লেকচারার। বক্তৃতার কায়দাটা দ্যাখ।

অন্য পাশ থেকে মধুঋতা বলল, —চেহারাটা কিন্তু দারুণ। হেভি সেক্সি। একেই রাফ অ্যান্ড টাফ বলে, না রে?

—আমরা এরকম একটা টিচার পেলাম না। সব শুড্ডা শুড্ডা পার্টি .....

—তোর খুব পছন্দ মনে হচ্ছে? যা না, গিয়ে আলাপ করে আয়। শ্রেয়সী চোখ টিপল, —তোকে স্পেশাল কেয়ার নিয়ে দুধ পান বোঝাবে।

ভাষণ থেমেছে। বক্তা হঠাৎ জটলা ছেড়ে এদিকেই আগুয়ান। তন্নিষ্ঠার সামনে এসে এক গাল হাসল, —তুমি এখানে?

তন্নিষ্ঠা অপাঙ্গে দুই বান্ধবীর ভেবলে যাওয়া মুখ দুটো দেখে নিল একবার। মুচকি হেসে বলল, —আমি তো আসবই, এটা আমার কলেজ। তুমি এখানে ভিড়লে কোত্থেকে?

—আমার এক পাড়ার দাদা, তার এক ভাইঝি এখানে পড়ে, এই কলেজের প্রেসিডেন্ট সেই দাদাটির .... ও এক জটিল ইকুয়েশান। যাক গে, আমার বিজ্ঞান মঞ্চের প্রোগ্রাম কেমন লাগল?

তন্নিষ্ঠা বান্ধবীদের দেখিয়ে দিল —এদের জিজ্ঞেস করো। এ হল শ্রেয়সী বসু। আর এ মধুঋতা চাকলাদার। সরি, এখন তো চেঞ্জ হয়ে ...., কী যেন রে?

—রাহা। মধুঋতা বোকা বোকা মুখ সপ্রতিভ করার চেষ্টা করল, —আপনি?

—আমি অভিমন্যু। হাটে বাটে ঘাটে ভেল্‌কি দেখিয়ে বেড়াই। পুরো নাম অভিমন্যু ভেল্‌কিবাবা।

তন্নিষ্ঠা বলে উঠল, —অভিমন্যু গন্ধবাবা নয় কেন?

—হ্যাঁ, তাও বলতে পারো। তবে ওই পরিচয়টা এখানে ঠিক খাটে না।

মধুঋতা শ্রেয়সী কিছুই বুঝতে পারছে না। চোখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

তন্নিষ্ঠা ঠোঁট টিপে বলল, —অভিমন্যু একজন মিনি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। পারফিউমের বিজনেস।

—ওমা তাই? শ্রেয়সী মুগ্ধ চোখে তাকাল, —কী কিউট! কী পারফিউম

বানান আপনি?

—না না, সে বলার মতো কিছু নয়। অভিমন্যু যেন অস্বস্তি বোধ করল। এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে তন্নিষ্ঠাকে বলল, —তুমি কি এখন আছ কিছুক্ষণ?

— সাড়ে-সাতটা আটটা পর্যন্ত তো আছিই। তন্নিষ্ঠা কবজি উল্টে ঘড়ি দেখল, —তাসের দেশটা দেখব, ব্রত গোস্বামীর আবৃত্তিটা শুনব .....। তোমার কী প্রোগ্রাম? এক্ষুনি তল্‌পি তল্‌পা গোটাবে?

—ছটা অব্দি আছি। দেখি, বিজ্ঞানের যুগে কেউ যদি একটু বিজ্ঞান সম্পর্কে ইন্টারেস্ট দেখাতে আসে...। অভিমন্যুর পরনে জিনস্ আর হাল্‌কা গেরুয়া রঙ পাঞ্জাবি, হাত দুটো পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে বলল, —তুমি তা হলে এখন অডিটোরিয়ামেই থাকবে?

—হুঁউ। কেন?

অভিমন্যু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগে ঘরের ও প্রান্ত থেকে তার এক অনুচর ডাকছে তাকে, দ্রুত পায়ে চলে গেল সেদিকে।

ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেই দুই বান্ধবী ঝাঁপিয়ে পড়েছে তন্নিষ্ঠার ওপর।

—খুব, অ্যাঁ দারুণ চুক্‌কি দিলি?

—কীসের চুক্‌কি?

—আহা নেকু! বুঝি না যেন কেন তুই এদিকে আমাদের ডেকে নিয়ে এলি!

—শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিলি বুঝি? অবাক হওয়ার ভান করল কেন?

—কদ্দিন ধরে চালাচ্ছিস?

—এই না না। বিশ্বাস কর ...। তন্নিষ্ঠা দু হাত তুলে দিল, —ছেলেটাকে আমি জাস্ট চিনি। ইউনিভার্সিটির ক্লাসমেট মালবিকার বিয়ে হল গত মাসে, ওখানেই আলাপ। মালবিকার বরের বন্ধু।

—ওসব ঢপ তুই অন্যকে দিস। মধুঋতার চোখে ব্যঞ্জনা ফুটে উঠল, —আমি এখন ছেলেদের চোখ দেখলে বুঝতে পারি। ওই চোখের ল্যাঙ্গুয়েজই আলাদা।

ছ বছর হল বিয়ে হয়েছে মধুঋতার, সে এখন নিজেকে পুরুষচরিত্রঅভিজ্ঞা রমণী বলে মনে করে। তন্নিষ্ঠা একবার ভাবল তার বিয়ে স্থির হয়ে যাওয়ার কথাটা বলে দেয় বন্ধুদের। সেই মধুর বিয়ের পর আজ আবার এই প্রথম দেখা বন্ধুদের সঙ্গে, শৌনকবৃত্তান্ত এরা কিছুই জানে না। থাক গে, শুনলে বেচারাদের এরকম একটা টাটকা খোরাকে জল পড়ে যাবে।

মজা করে বলল, —তোর তো এখন একজনেরই চোখের ল্যাঙ্গুয়েজ জানার কথা মধু, সব ছেলের চোখের ভাষা বোঝা তুই শিখলি কোত্থেকে?

—জানিস না, বিয়ে হলে থার্ড আই গজায়?

—সেই চোখে তুই পরপুরুষ দেখিস? সায়ন্তনকে ডজ মেরে খুব চালিয়ে যাচ্ছিস, অ্যাঁ?

—যেতেই পারি। মধুঋতা সিঁথিতে আঙুল ঠুকল, —এটাকে অ্যাপারেন্টলি রেড সিগনাল বলে মনে হয়, আসলে এটাই গ্রিন সিগনাল। আমি এখন পূর্ণ

স্বাধীন, বিপদ আপদের কোনও চান্স নেই।

—অ্যাই মধু, থাম্। তনুর ট্র্যাপে পা দিস না। বুঝছিস না, ও কায়দা করে লাইন ঘুরিয়ে দিচ্ছে? শ্রেয়সী চিমটি কাটল তন্নিষ্ঠাকে, তনু, খুলে বল্ না বাবা কেসটা।

—বিশ্বাস কর, কিইইচ্ছু নেই।

ইচ্ছে করে কথাটায় একটু ঢেউ খেলিয়ে দিল তন্নিষ্ঠা। যাতে রহস্যটা খুলেও না খোলে। অথবা রহস্যহীনতা একটা মোড়কের আস্তরণে থেকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল তার এই দুই বান্ধবী কলেজ ছাড়ার পরও বিশেষ বদলায়নি।

কলেজেই এদের ধারণা ছিল ছেলে আর মেয়েদের বুঝি একটাই সম্পর্ক। খাদ্য খাদক, বা ঘি আগুন, এই গোছের। কলেজে ছেলেদের থেকে একটু দূরে দূরেই থাকত এরা। মানসিক ভাবে শ্রেয়সী এখনও এগোতে পারেনি, মধুঋতা বিয়ে হয়েও না। বি এ পাশ করেই দুজনে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে, আর একটু এগোলে কি এদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাত? মনে হয় না। সম্ভবত এদের রক্ষণশীলতার বীজ বাড়িতেই পোঁতা আছে। প্রতি পদে এদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে তুমি মেয়ে। সম্ভবত কেন, নিশ্চয়ই। ভাগ্যিস তন্নিষ্ঠা ওই রকম কোনও পরিবারে জন্মায়নি!

মানসিক খিচখিচ সত্ত্বেও এই বন্ধুদের সঙ্গ ভাল লাগছিল তন্নিষ্ঠার। দীর্ঘ অদর্শনের পর সাক্ষাৎটাই একমাত্র কারণ নয়, ফেলে যাওয়া কলেজটাও কেমন অনুঘটকের কাজ করছে। এই করিডোরেই তো কেটেছে কত উচ্ছ্বাসময় দিন। ওই ছোট্ট ঘরটায় অনার্সের ক্লাস হত। সেকেন্ড ইয়ার, না না থার্ড ইয়ারে পড়ার সময়ে। একদিন ক্লাসরুমের দরজা ভেজিয়ে জয়ন্ত সিগারেট ধরিয়েছিল, তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে জোর একটা টান দিয়েছিল তন্নিষ্ঠা, সঙ্গে সঙ্গে কী কাশি। এবং ঠিক সেই সময়েই দরজা ঠেলে উর্মিলা ম্যাডাম .....। ক্যান্টিন অফিস লন কমনরুম কোথায় যে সোনালি মুহূর্তের কুচি ছড়ানো নেই!

আজ রবিবার, তবু কলেজ বেশ জমজমাট। তিনতলা বিশাল বিল্ডিং-এর প্রায় প্রতিটি আনাচে কানাচে তরুণ তরুণী। সবই প্রায় অচেনা মুখ, বর্তমান ছাত্রছাত্রী। হঠাৎ হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে যায় এক আধটা পরিচিত প্রাক্তনী, দাঁড়িয়ে পড়ে কুশল বিনিময় করে, কিংবা মৃদু হেসে চলে যায় পাশ কাটিয়ে। দোতলার অডিটোরিয়াম গেটেই সব চেয়ে জমাট ভিড়, অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে।

তন্নিষ্ঠারা অডিটোরিয়ামের দিকেই এগোচ্ছিল, সামনে তন্ময়। গটগট হেঁটে আসছিল তন্ময়, তন্নিষ্ঠাদের দেখে থেমে গেল। চোখ পিটপিট করে বলল, —কী রে, তোরা এসেই একটা গ্রুপ তৈরি করে নিয়েছিস?

তন্ময় ব্যাচেরই ছেলে, তবে অনার্সের নয়, পাসের ক্লাসে দেখা হত মাঝে মাঝে। ইউনিয়ন করার সুবাদে ক্লাসের প্রায় সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে মোটামুটি হৃদ্যতা ছিল তন্ময়ের।

তন্নিষ্ঠা হেসে বলল, —আমাদের ব্যাচের আর তো কাউকে দেখছি না?

—আছে কয়েকজন। হলে। বেশির ভাগই অফ্। যে যার ধান্দায় ঘুরছে আর কী।

— তুই করছিস কী এখন?

—আর্মস কালেক্ট করছি।

তন্নিষ্ঠা হকচকিয়ে গেল। মধুঋতা পাশ থেকে আমতা আমতা করে বলল, —মানে?

—যুদ্ধ লড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। বেকারির বিরুদ্ধে।

— বুঝলাম না।

—তোরা বুঝবি কী করে? সব তো বিয়ে করে করে বরের কোর্টে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিস। মেজাজে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল তন্ময়, —আমাদেরও তো বউ ধরার জন্য কোর্ট তৈরি করতে হবে, না কি?

—খালি ভাট বকা অভ্যাস! করছিসটা কী বল না? লঘু ধমক দিল তন্নিষ্ঠা।

—গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর ভর্তি হয়েছিলাম পাইন কলেজ অব ফারদার এডুকেশানে। সেখানে প্রথমে একটা ছ' মাসের ম্যানেজমেন্ট কোর্স করে ফেললাম। চাকরি হল না। তার পর করলাম ছ মাসের কম্পিউটার কোর্স। তাতেও কিছু হল না। তারপর তিন মাস টাইপ। এক অবস্থা। তারপর আবার ছ মাস কম্পিউটার শিখতে চেয়েছিলাম, বাবা জুতো দেখাল। আবার একটা কোর্সে যুতে গেলাম। সস্তার। পাবলিক রিলেশানস্। একটা শ্বাস ফেলল তন্ময়,—শুধু অস্ত্র শস্ত্রই জোগাড় করে যাচ্ছি, চালানোর স্কোপ পাচ্ছি না। চাকরির লটারিটা শালা কিছুতেই উঠছে না! মার্কেট কী ডাউন মাইরি!

পলকের জন্য শুভেন্দুর মুখটা মনে পড়ল তন্নিষ্ঠার। ভি আর-এর চিঠি পেয়ে বাবা ভেতরে ভেতরে এত ভেঙে পড়েছে, শতেক বাহানা দেখিয়ে অনবরত অফিস ডুব মারছে এখন। রোজ মার সঙ্গে খটাখটি! ভাল্লাগে না।

তন্নিষ্ঠা একটু বিরস গলাতেই তন্ময়কে বলল, —খুব তো ইউনিয়ন করতিস, এখন তোর দাদারা কী বলে?

—সেখানে আমার থেকে অনেক সরেস মাল বডি ফেলে বসে আছে। এনট্রিই নিতে পারছি না। তাও আমি অবশ্য এম-এল-এর দরজায় ইঁট পেতে রেখে এসেছি। তবে লাইন পৌঁছতে পৌঁছতে তন্ময় শিকদার বুড়ো ভাম হয়ে যাবে। ...এখন আমি একটা নতুন ফ্রন্ট খুলছি। জ্যোতিষ। এটা না লাগলে হোমিওপ্যাথি ট্রাই নেব। সেটাও না লাগলে অন্য একটা বিজনেস। অটো কিনে চালাব। তন্ময় হ্যা হ্যা হাসছে, হাসিতে আনন্দের চেয়েও ব্যঙ্গ বেশি। সঙ্গে যেন হাহাকারের কণাও মিশে আছে। মলিন টিশার্ট পরা তন্ময় একদা বান্ধবীদের পার হয়ে গেল। খানিক দূরে গিয়ে কথা ছুড়ল আবার,—অটোটা যদি কিনে ফেলি, তোদের একদিন ফ্রি চড়িয়ে দেব।

তন্ময় চলে যাওয়ার পর একটুক্ষণ নীরব তিন বান্ধবী।

একটু পরে শ্রেয়সী মুখে চুকচুক শব্দ করল,—বেচারা।

মধুঋতা বলল, —শুধু বেচারা নয়, বল আহা বেচারা। মনে আছে কী দাপটে লেকচার দিত ক্লাসে? স্যারদের অবলীলায় বলত, একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়ান তো, মিনিট দশেকের একটা ছোট্ট ইয়ে সেরে নিই!

মধুঋতার বাক্‌ভঙ্গিতে একটুও হাসি পাচ্ছিল না তন্নিষ্ঠার। তন্ময়ের মরিয়া লড়াই দেখে বিষণ্ণ বোধ করছিল। আগামী দিন বুঝি আরও ভয়ঙ্কর। শৌনকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলেই কি মুশকিল আসান? উঁহু, জন্ম থেকে মাকে চাকরি করতে দেখছে তন্নিষ্ঠা, অচেতনে সেই ছবিটাই মাথায় গাঁথা থাকে সর্বক্ষণ, চাকরি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকার কথা তন্নিষ্ঠা ভাবতেই পারে না। তার কপালেও কিছু জুটবে কি?

শ্রেয়সী চিমটি কাটছে তন্নিষ্ঠাকে। চাপা স্বরে বলল, —এই, এই, এই তনু, তোর অভিমন্যু আসছে!

তন্নিষ্ঠা এদিক ওদিক তাকাল, দেখতে পেল না,। বলল, —কই? কোথায়?

—ওই তো করিডোরের এন্ডে। কাকে যেন খুঁজছে। বোধহয় তোকেই।

সত্যিই তো! ওই তো অভিমন্যু! তার হাইপাওয়ার চশমা পরা চোখ করিডোরের ছেলেমেয়েদের মাঝে ইতিউতি ঘোরে যেন?

তন্নিষ্ঠা ঈষৎ বিরক্ত হল। বন্ধুদের ভুল ধারণাটাকে সত্যি প্রমাণ করার জন্য এত কেন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে অভিমন্যু?

ভেবেছিল মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে, তার আগেই অভিমন্যু পৌঁছে গেছে। মুখে দেঁতো হাসি নেই, বরং যেন গম্ভীর। একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বলল,—তোমাদের কলেজটা তো যাচ্ছেতাই!

চোখ সরু করে তাকাল তন্নিষ্ঠা, —কেন, কী হল?

—সেই দুপুর বারোটা থেকে আমার ছেলেমেয়েরা একটানা শো করে যাচ্ছে, তাদের সামান্য একটা টিফিনের ব্যবস্থা পর্যন্ত করা হবে না? দু বার কেটলি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল, ব্যস?

তন্নিষ্ঠা অপ্রস্তুতের একশেষ। ছিঃ, কী উল্টোপাল্টা ভাবছিল!

যেন অভিমন্যু কলেজের নয়, তারই অতিথি, এমন স্বরে বলল,—সে কী! মিষ্টি খাবার কিচ্ছু দেয়নি?

—তাহলে আর বলছি কী!...ওরা মুখ ফুটে কিচ্ছু বলছে না, কিন্তু আমার তো খারাপ লাগছে। তোমাদের ইউনিয়নের পাণ্ডাকে ধরলাম, সে হচ্ছে হচ্ছে পাঠিয়ে দিচ্ছি বলে কোথায় যে হাওয়া মারল... তাও তো প্রায় ঘণ্টা খানেক! এই দুঃখেই আমি কলকাতার কলেজ টলেজে শো করতে চাই না।

রীতিমত আহত হয়েছে তন্নিষ্ঠা। কলেজের সম্পর্কে দুর্নাম যেন তাকেও বিঁধছে। বলল,—তুমি এক সেকেন্ড দাঁড়াও, আমি দেখছি।

বলেই ছুটেছে অডিটোরিয়ামে। সেখানে এখন মহা হট্টগোল, স্টেজ সাজানো চলছে। এই মাত্র প্রেসিডেন্ট কাম এম এল এ এসেছেন, তাঁকে ঘিরে গ্রহমণ্ডলীর মতো ঘুরছেন প্রিন্সিপাল আর কয়েকজন অধ্যাপক। এখনকার ইউনিয়নের

ছেলেমেয়েদের আদৌ চেনে না তন্নিষ্ঠা, চেনার কথাও নয়। মরিয়া হয়ে তন্নিষ্ঠা স্টেজে উঠেছে। তাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের টিকেজিকে দেখতে পেয়ে হালে পানি পেল।

একটু দূর থেকে টিকেজিকে ডাকল তন্নিষ্ঠা,—স্যার?

মধ্যবয়সী তরুণকুমার গুপ্ত ফিরে তাকিয়েছে।

তন্নিষ্ঠা সামনে গিয়ে একটা প্রণাম করল,—চিনতে পারছেন স্যার? আমি তন্নিষ্ঠা দাশগুপ্ত। নাইনটি টুর ব্যাচ।

—চিনেছি। প্রেসিডেন্ট জগন্নাথ ভৌমিক স্টেজের দিকে এগোচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে থমকাল তরুণ গুপ্ত। মুখে অন্যমনস্ক হাসি টেনে বলল, —কী করছ এখন?

—এবার স্লেটে বসেছি।

—বাহ্ বাহ্, খুব ভাল।

কথাটা বলেই জগন্নাথবাবুকে ধাওয়া করতে যাচ্ছিল তরুণ গুপ্ত, তন্নিষ্ঠা পিছু ডাকল, —স্যার, একটা কথা ছিল।

তরুণ গুপ্ত ভুরু কুঁচকোল,—কী?

—আমার একজন পরিচিত, কলেজে সায়েন্স এগ্‌জিবিশান করছে, ওদের এখনও স্ন্যাকস্ ট্যাকস্ কিছু দেওয়া হয়নি...

—তার আমি কী করব? সায়েন্সের বীরেনবাবুকে গিয়ে বলো। উনি এগ্‌জিবিশানের চার্জে আছেন।

—আমি তো স্যার ঠিক...

—তাহলে ইউনিয়ন রুমে যাও। ওরাই বোধহয় কুপন টুপন দেবে।

বলতে বলতে জগন্নাথবাবুর দিকে ছুটল তরুণ গুপ্ত। প্লুটো থেকে বুধ হওয়ার প্রচেষ্টায়। হেসে হেসে কথা শুরু করেছে ভদ্রলোকের সঙ্গে, বিগলিত ভঙ্গিতে হাত কচলাচ্ছে।

অপমানিত মুখে অডিটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে এল তন্নিষ্ঠা। রোদ মরে গেছে, ছায়া ঘনাচ্ছে। তন্নিষ্ঠা মন্থর পায়ে ফিরছিল। শ্রেয়সীরা নেই, অভিমন্যু একা দাঁড়িয়ে করিডোরে।

তন্নিষ্ঠাকে দেখে অভিমন্যুর ঠোঁটে চোরা হাসি,—হল অ্যারেঞ্জমেন্ট?

তন্নিষ্ঠা গুম গুম গলায় বলল, —তোমার কজন আছে? চলো, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

—হাহ্, তুমি কেন খাওয়াবে? অভিমন্যু ঘড়ি দেখে বলল, —যাই, আমি একবার চা খেয়ে আসি, তখনি দোকানে বলে দেব, ওরা একে একে টিফিন করে যাবে।

তন্নিষ্ঠা বলে ফেলল,—চলো, আমিও যাব।

—এখন নামবে তুমি? এক্ষুনি তো তোমাদের প্রোগ্রাম স্টার্ট হবে।

—হোক গে। চলো।

অভিমন্যু চোখ ছোট করে দেখছে তন্নিষ্ঠাকে।

তন্নিষ্ঠা ঝেঁঝে উঠল, —আমি গেলে তোমার অসুবিধে হবে?

অভিমন্যু হেসে ফেলেছে, —নিজের কলেজের দোষস্খালন করতে চাইছ?

—সে তুমি যা বোঝো তাই।

রাস্তার ওপারে ছোট্ট মতন রেস্টুরেন্ট। চা কেক টোস্ট ওমলেট ঘুগনি চপ সিঙাড়া পাওয়া যায়। ছোট ছোট নড়বড়ে কাঠের বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসল দুজনে, সামনে টিনের টেবিল।

অভিমন্যু জিজ্ঞাসা করল, —কী খাবে?

—কিচ্ছু না। শুধু চা।

—সে হয় নাকি! কিছু একটা অন্তত খাও। নইলে আমি খাই কী করে?

—আমি তো দুপুর থেকে চেঁচাচ্ছি না, সুতরাং আমার না খেলেও চলবে।

—কলেজের ওপর খুব চটেছ মনে হচ্ছে?

—গায়ে চামড়া থাকলে তো চটারই কথা। ছি ছি, তোমাদের ইনভাইট করে এনে...। আমাদের সময়ে কক্ষনও এরকম হত না।

—তোমাদের সময়ে সব নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন হত, তাই তো?

—হতই তো।

—বুড়োটে কথাবার্তা বোলো না। আমাদের কালে সব গোল্ডেন ছিল, এখন সব খারাপ...! বাজে কথা। কলেজে ফাংশান টাংশান হলে চিরকাল এরকম হয়। সে কি বা তোমাদের সময়ে, কি বা আমাদের সময়ে। দু চারটে ছোটখাটো ইরেগুলারিটি না ঘটলে অনুষ্ঠানগুলো স্মৃতিতেই থাকে না। আমি তোমাদের কলেজের এগেনস্টে সব চার্জ মনে মনে উইথড্র করে নিয়েছি।...এবার অন্তত হাসো।

আর মুখ ভেটকে থাকা হল না তন্নিষ্ঠার, ফিক করে হেসে ফেলেছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি হাফপ্যান্ট পরা এক বুড়ো মতো লোক জল দিয়ে গেল টেবিলে, তাকে টোস্ট ওমলেটের অর্ডার দিল অভিমন্যু, সঙ্গে আরও কটা বানিয়েও রাখতে বলল, ঠোঙায় করে নিয়ে যাবে। সিগারেট ধরিয়েছে একটা।

পাঞ্জাবির হাতা গোটাতে গোটাতে বলল,—তোমার বান্ধবীর শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলে নাকি এর মধ্যে?

—নাহ, হয়ে ওঠেনি।

—আমি গেছিলাম। এই তো কবে যেন সন্ধেবেলা খুব মেঘ মেঘ করল, বৃষ্টি হল না...?

—শুক্রবার?

—তা হবে। মালবিকা আইসক্রিম বানিয়েছিল, খাওয়াল।...দারুণ হানিমুন করে এসেছে ওরা। ভিড় পায়নি বিশেষ। ওখান থেকে গুর্দুম ফরেস্টে গিয়েছিল। যেখানে সেখানে ট্রেকিং করেছে...। সুপ্রিয় দু রিল ছবি তুলেছে, দেখাচ্ছিল।

—হুঁ? গিয়ে দেখে আসতে হবে।

—কবে যাবে?

—দেখি। ঠিক নেই।

অভিমন্যু একটু যেন হতাশ হল মনে হয়। টেবিলে রাখা দেশলাই-এর বাক্সটা হাতে ঘোরাচ্ছে। হঠাৎ বলল,—যদি যাও...আমাদের বাড়ি কিন্তু ওদের বাড়ির খুব কাছে।

আমন্ত্রণ? না তথ্য জ্ঞাপন?

অভিমন্যুর চোখে ঝলক চোখ রাখল তন্নিষ্ঠা,—তোমাকে বাড়িতে গেলে পাওয়া যাবে?

—দিনের বেলা ফ্যাক্টরিতে থাকি, সেটাও কাছেই। সেন্টের কারখানা বললে যে কেউ দেখিয়ে দেবে। সন্ধের পর বাড়িতেই অ্যাভেলেবল।

—আড্ডা ফাড্ডা নেই? তন্নিষ্ঠা টেরচা চোখে তাকাল,—বান্ধবী টান্ধবী?

—আছে তো। এই যেমন ধরো তুমি।

—দূর, আমার মতো কেন? স্পেশাল কেউ।

—তা জেনে তোমার লাভ?

—এমনিই। জাস্ট কৌতূহল।

—মেয়েলি কৌতূহল।

—মেয়েলি কৌতূহল?

—অ্যাই, বাজে কথা বলবে না। ছেলেদের কৌতূহল থাকে না?

—থাকে বইকী। একটু বেশি রকমই থাকে। যেমন এই মুহূর্তে আমার জানতে ইচ্ছে করছে তোমার শৌনককুমার মানুষটি কেমন?

—চলতা হ্যায়। তন্নিষ্ঠা ঠোঁট চেপে একটু ভাবল,—স্মার্ট। হ্যান্ডসাম। হাইট পাঁচ সাড়ে আট। কমপ্লেকশন ডার্ক ব্রাউন। চুল স্লাইট কোঁকড়া। চোখ দুটো ব্রাইট। নাকটা একটু...

—থামো থামো এ তো নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন! আমি জিজ্ঞেস করছি তোমার ইঞ্জিনিয়ার সাহেব...

—নেচারের কথা বলছ? হাসিখুশি, কিন্তু সিরিয়াস, গুছিয়ে কথা বলতে পারে। নিজের মতকে সুন্দর যুক্তি দিয়ে সাজাতে পারে। মেজাজ হারায় না...

অভিমন্যু মিটিমিটি হাসছে,—উঁহু, এতেও মানুষটাকে বোঝা গেল না।

আর কী জানতে চায় অভিমন্যু? শৌনক কেরিয়ার সচেতন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, আবেগের চেয়ে যুক্তিকে বেশি প্রাধান্য দেয়, শৌনকের ভালবাসা বড্ড তাড়াতাড়ি শরীরী হতে চায়, এই সেদিনও নিউ এম্পায়ারে প্রেটি উওম্যান দেখতে গিয়ে শৌনক....। কিন্তু এসব কি গুণ, না দোষ? যাই হোক না কেন, তন্নিষ্ঠা এত কথা কেন বলতে যাবে অভিমন্যুকে? তাও এই সামান্য আলাপে?

তন্নিষ্ঠা চোখ ঘোরাল,—শৌনকের কথা ছাড়ো, তোমার কথা বলো। তুমি মানুষটা কী রকম?

—যেমন দেখছ।

—উঁহু, যা দেখছি সেটাই সব নয়। তন্নিষ্ঠা ক্ষণিক জরিপ করল অভিমন্যুকে। জেরা করার ভঙ্গিতে বলল,—এ সব খ্যাপামি করে বেড়াও কেন?

—খ্যাপামি?

—বান্‌জারাদের মতো চেঁচাচ্ছ, ঘুরে ঘুরে বিজ্ঞানের খেলা দেখিয়ে বেড়াচ্ছ......

—বা রে, মানুষকে কনশাস করে বেড়াতে হবে না? মানুষ হিসেবে এটা তো আমার কর্তব্য।

—তাহলে আর ব্যবসা ট্যবসা করার দরকার কী? এসব করে বেড়ালেই হয়।

অভিমন্যু শব্দ করে হেসে উঠল,—ব্যবসা তো করি আমি পেট চালানোর জন্যে।.....। অবশ্য সুগন্ধ তৈরি করাটা আমার নেশাও বটে। আই হ্যাভ এ প্যাশান ফর ফ্রাগরেন্স।

—এক দিকে বিজ্ঞানমঞ্চ, অন্য দিকে ফ্রাগরেন্স! তোমার দুটো নেশা কিন্তু মেলে না।

—অফকোর্স মেলে। মানুষের মন থেকে কুসংস্কার মরে গেলে এক ধরনের সুরভি তৈরি হয়।

বাবাও এই ধরনের কী একটা কথা বলে না? একটা ভাল নাটক, একটা ভাল বই, কিংবা একটা ভাল সিনেমা মানুষের মনে সুবাস ছড়িয়ে দিতে পারে!

টোস্ট ওমলেট এসে গেছে। ছেলেমেয়েদের খাবারও তৈরি, বড় একটা প্যাকেটে পুরে ফেলেছে রেস্টুরেন্টের লোকটা। অভিমন্যুর নির্দেশে সে ছুটেছে কলেজে।

তন্নিষ্ঠা ওমলেটে চামচ চালাতে চালাতে বলল,—তুমি কিন্তু একটু পিকিউলিয়ার আছ।

—তাই কি? কে স্বাভাবিক, কে পিকিউলিয়ার তার তফাত তুমি করতে পারো?

চটজলদি জবাব এল না তন্নিষ্ঠার ঠোঁটে। স্থির চোখে ছেলেটাকে দেখছিল। মাথা নামিয়ে প্লেট টেনেছে অভিমন্যু, বুভুক্ষুর মতো খাচ্ছে গপাগপ। চামচের পরোয়া না করে, হাত দিয়েই। একটি কথাও আর বলছে না এখন। শৌনক যত ক্ষুধার্তই হোক, কক্ষনও এভাবে খাবে না।

ভাবনাটা চমকে দিল তন্নিষ্ঠাকে। আশ্চর্য, শৌনকের সঙ্গে তুলনা এল কেন?

ছয়

বাসবেন্দ্রর ভরাট কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল,—তাহলে আমরা এবার মিটিং শুরু করতে পারি?

—করাই তো উচিত। নির্মল ঘড়ি দেখল,—সাড়ে ছটা বাজে। অলরেডি আমরা আধ ঘণ্টা লেট।

—আমি অ্যাজেন্ডা পড়ছি। প্লিজ, সাইলেন্স।

সমিধের ঘর আজ কানায় কানায় পূর্ণ। চেয়ার টুল বেঞ্চিতে স্থান সংকুলান হচ্ছে না, কিছুটা ঠাসাঠাসি করেই বসেছে অনেকে। গ্রুপের মোট সদস্যসংখ্যা ছাব্বিশ, আজ তেইশ জন উপস্থিত। শুভেন্দুদের বয়সী মেম্বার মাত্র সাত আট জন, বাকিরা বেশির ভাগই তরুণের দলে। মহিলাও আছে জনা চারেক, বাসবেন্দ্রর স্ত্রী সমেত। এতক্ষণ ভাঁড়ে ভাঁড়ে চা পান চলছিল, সঙ্গে অল্পবিস্তর অসংলগ্ন আড্ডা, বাসবেন্দ্রর ঘোষণায় ঘর এক লহমায় গুঞ্জনহীন।

টেবিল থেকে সমিধের একটা প্যাড হাতে তুলল বাসবেন্দ্র,—আমাদের প্রথম অ্যাজেন্ডাম, সমিধের আগামী নাটক। দুই, সদস্যদের আচরণবিধি সম্পর্কে আলোচনা। তিন, বিবিধ।......প্রথমটা দিয়েই সভা শুরু হোক।

প্রণবেশ শুভেন্দুর পাশের চেয়ারে। হাতের ভাঁড়ে সিগারেট নিবিয়ে সে উঠে দাঁড়াল,—আমি কি প্রথমে বলতে পারি?

—বলো।

প্রণবেশ দু পকেটে হাত ঢোকাল। কয়েক সেকেন্ড চুপ, বক্তব্য সাজিয়ে নিচ্ছে মনে মনে। তারপর বলল,—আলোচনার গোড়াতেই একটা কথা বলে নিতে চাই। আমাদের গ্রুপের বয়স বাইশ বছর পার হয়ে গেছে, এখনও পর্যন্ত আমরা নামিয়েছি ষোলোটা প্রোডাকশন। প্রথম দিকে চোদ্দো পনেরোটা বছর আমাদের দল খুব টালমাটাল অবস্থার ভেতর দিয়ে গেছে। তবু আমরা ভেঙে পড়িনি। উইথ নিউ জিল আমরা পর পর নাটক নামিয়ে গিয়েছি। ওই কঠিন সময়েও। গত কয়েক বছরে আমাদের দলের কিছু গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। এতদিন পর আমরা ক্রমশ কয়েকটা নাটক মঞ্চস্থ করেছি, যেগুলো দর্শকরা খুব ভাল ভাবে নিয়েছে। পর পর তিনটে নাটক সাকসেসফুল, এমন দল পশ্চিমবঙ্গে কটা আছে হাতে গুনে বলা যায়। এই তিনটে নাটক আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে, সমিধ এখন সমস্ত বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে এক অতি পরিচিত নাম। যার সুযোগ্য নেতৃত্বে সমিধ আজ এইখানে পৌঁছেছে, দলের প্রত্যেক সদস্যের পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন না জানালে সেটা অন্যায় করা হবে........

নির্মল উসখুস করে উঠল,—প্রণবেশ, কাজের কথায় এসো।

বাসবেন্দ্র হেলান দিয়ে বসে ছিল। চোখ বুজে। নড়েচড়ে উঠল। মৃদু ধমকের সুরে বলল,—প্রণবেশ, আমাদের গ্রুপে ব্যক্তিপূজার কোনও স্থান নেই, তুমি জানো। আমাদের প্রতিটি সাফল্যই দলের, নো ইনডিভিজুয়াল শ্যাল গেট ইটস্ ক্রেডিট। এটাই আমাদের ঘোষিত নীতি।

প্রণবেশ সহাস্যে বলল,—ওকে, ওকে। কাজের কথায় আসি। আমাদের লাস্ট যে তিনটে প্রোডাকশন সাকসেসফুল হয়েছে সেগুলোকে যদি আমরা অ্যানালিসিস করি, তাহলে কী দেখতে পাব? আমরা বর্তমান দর্শকদের রুচিটা মোটামুটি ধরে ফেলেছি। আমাদের ফর্মও দর্শকরা পছন্দ করেছে, কনটেন্ট্ও। এবং দর্শকদের রুচিবিকৃতি না ঘটিয়েই এটা করা সম্ভব হয়েছে। বলা যেতে পারে,

সাধারণ দর্শকের রুচিবোধকে আমরা আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছি। টু কিপ্ আপ দিস টেম্পো আমি এবার দলকে একটু অন্য ভাবে ভাবনা করতে বলছি। তোমরা কি কেউ দীনেন সেনগুপ্তর রংমশাল উপন্যাসটা পড়েছ?

দলের নবীন সদস্য বিশাখা শেষ প্রযোজনার কিছুদিন আগে সমিধে এসেছে। কোণ থেকে সে বলে উঠল,—আমি পড়েছি। হাল্কা উপন্যাস।

—হ্যাঁ, তেমন গভীর নয়, তবে বেশ একটা মজা আছে। বর্তমান সমাজটাকে একটু তির্যক ভাবে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। কনটেক্সটটা সোশাল, তার মধ্যেই...

—তা ঠিক। উপন্যাসের যে নায়ক, সে সব জায়গায় রিজেক্টেড হচ্ছে, তবে নরমাল ভাবে নয়। এমনকী তার প্রেমিকা, সে তাকে মুখে প্রত্যাখ্যান করছে না, অথচ অন্য একজনকে বিয়ে করার দিন তাকে রেজিস্ট্রি অফিসে সাক্ষী থাকার জন্য রিকোয়েস্ট করছে...। আইডিয়াটা একটু নতুন, তবে দাঁড়ায়নি। মাঝে মাঝে কেমন ছ্যাবলামি বলে মনে হয়।

—আমরা তো শুধু উপন্যাসের নির্যাসটুকু নেব। বাসবেন্দ্র নাট্যরূপ দেবে, ও তো মোটামুটি ঘষে মেজে ঠিক করে নেবেই, যেখানে যেখানে চার্জ আনার স্কোপ আছে আনবে। দরকার হলে এন্ডটাও একটু টুইস্ট করে দিতে পারবে বাসবেন্দ্র।...আই মিন ওই উপন্যাসটাকে ধরেই আমি পরের প্রোডাকশানটা নামানোর কথা ভাবছিলাম। আইডিয়াটা কি খুব খারাপ?

বাসবেন্দ্র সোজা হয়ে বসল,—আমিও উপন্যাসটি পড়েছি। ওতে উত্তম ড্রামার প্রচুর মালমশলা আছে। কোন্ নাটক দর্শকরা নেবে আগে থেকে বলা মুশকিল, তবু...মনে হয় রংমশালের বক্স পাওয়ার সম্ভাবনা হাই।

প্রণবেশের কথার সময়ে টুকটাক বাক্যবিনিময় চলছিল ঘরের আনাচে কানাচে, বাসবেন্দ্র বক্তব্য রাখার পর আবার হিরণ্ময় নীরবতা। যেন প্রণবেশের ইচ্ছেটায় কর্তৃত্বের সীলমোহর পড়ে গেছে, এমনই বোধ চারিয়ে গেছে সদস্যদের মধ্যে।

তরুণ সদস্য দ্বৈপায়ন হঠাৎ বলে উঠল,—তাহলে তো কাজ শুরু করে দেওয়াই যায়। বাসবদা ড্রামাটাইজেশানটা শুরু করে দিন, একটা ডেট্ ফিক্স করে সকলকে সেটা পড়ে শোনান।

বাসবেন্দ্র বলল,— দাঁড়াও, তাড়াহুড়ো কীসের? সকলের মতামতটা শুনি, আলোচনা হোক।

তৃণাঞ্জন তড়াক করে লাফিয়ে উঠল,—আর আলোচনার কী আছে? এ তো সেটলড্ই হয়ে গেল। বাসবদা যখন বলছেন গল্পটার প্রসপেক্ট আছে তখন নিশ্চয়ই আছে।

শুভেন্দু হতবাক চোখে সকলকে দেখছিল। আর চুপ থাকতে পারল না, বলে ফেলল,—কিন্তু একটা কথা তো ভাববার আছেই। সমিধের লং টার্ম ট্র্যাডিশান অরিজিনাল প্লে মঞ্চস্থ করা। বড় জোর দু চারটে অনুবাদ... টু বি এগ্জ্যাক্ট চারটে

অনুবাদ আমরা স্টেজ করেছি। বাট নেভার নেভার নেভার বিফোর একটা উপন্যাসকে আমরা...

বাসবেন্দ্র মৃদু স্বরে বলল,—উপন্যাস মঞ্চস্থ করায় কি কোনও ক্ষতি আছে সাহেব?

নির্মল বলে উঠল,—লাভ ক্ষতি তো ব্যবসার কথা বাসবেন্দ্র। উপন্যাসে আমার কোনও ছুতমার্গ নেই। টলস্টয় রবীন্দ্রনাথ অদ্বৈত মল্লবর্মন অনেক নাম আছে লিস্টে। অ্যান্ড দোজ আর সাকসেসফুল প্লে। আমাদের যুদ্ধযাত্রা বা অচিনপুরীর চেয়েও অনেক বেশি মঞ্চসফল। কিন্তু যে উপন্যাসটা করার কথা উঠেছে, সেটা কি ওই স্তরে পড়ে? বরং আমি একটা অলটারনেট প্রোপোজাল দিতে পারি। সাহেব দারিও ফোর একটা নাটক অনেকটা ট্রানস্লেট করে ফেলেছে, তুমি বোধহয় জানোও, হোয়াই কান্ট উই প্রসিড উইথ দ্যাট ওয়ান? ফো'র নাটক আমরা আগে করিনি, এটা একটা স্বাদ বদলানোও হবে। প্লাস, ফো'র স্যাটায়ার বর্তমান দিনে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। অন্তত আমাদের দেশে। হাসি মজা গান মিলিয়ে ও নাটক জমেও যেতে পারে।

—হয়তো। বাসবেন্দ্র সিগারেট ধরাল,—কিন্তু দর্শকরা এখন যখন সমিধের নাটক দেখতে আসে, তখন একটা বিশেষ প্রত্যাশা নিয়ে আসে। সেটা তো ফুলফিল করতে পারব না।

সঙ্গে সঙ্গে প্রণবেশও বলে উঠেছে,—সুতরাং আমাদের ওই এক্সপেরিমেন্টেশানে না যাওয়াই ভাল।

—স্ট্রেঞ্জ, এখন সমিধের কোমরের জোর হয়েছে, এখনই তো পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর সময় ! আমরা স্টেট থেকে গ্র্যান্ট্ পেয়েছি, সেন্ট্রাল থেকে গ্র্যান্ট্ পেয়েছি, ওয়ার্কশপ চালাচ্ছি, সেমিনার করছি, নতুন নতুন ছেলেমেয়েরা আমাদের কাছে নতুন থট্ এক্সপেক্ট করে, সেখানে আমরা আবার ট্র্যাডিশনাল সোশাল স্টোরিতে ফিরে যাব ? আই বেগ টু ডিফার। বাসবেন্দ্র, তুমি আমার নোট অফ ডিসেন্ট লিখে রাখো।

কে যেন চাপা স্বরে মন্তব্য ছুড়ল,—ও ভাবে কি সাহেবদাকে প্রোমোট করা যাবে ?

—কে ? কে বলল কথাটা ?

ঘরে কবরখানার নৈঃশব্দ্য।

নির্মল তেতো হেসে বলল,—যে কথাটা উচ্চারণ করল তার জেনে রাখা উচিত আমাদের দলে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে সে স্বচ্ছন্দে তার বক্তব্য রাখতে পারে।

এবারও কোনও উত্তর নেই।

নির্মল হা হা হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল,—বাসবেন্দ্র, আমাদের গ্রুপ কি ভেড়ায় ভরে গেল?

—উইথড্র উইথড্র। সুজিত চেঁচিয়ে উঠেছে,—আপনার কোনও রাইট নেই

আমাদের ইনসাল্ট করার।

আরও দু তিনটে দিক থেকে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ভাষা খুব শ্রুতিসুখকর নয়, মন্তব্যগুলোও রীতিমতো হৃদয়বিদারক। মোদ্দা অভিমত একটাই, নির্মলকে ক্ষমা চাইতে হবে।

নির্মল এতটুকু নুইতে রাজি নয়। সে চেঁচামেচিকে আমলই দিচ্ছে না। হট্টগোল ক্রমশ চড়ছিল, বাসবেন্দ্র মন্ত্রবলে সকলকে শান্ত করে ফেলল। গমগমে গলায় বলল,—নির্মল তো এক্সাইটেড হতেই পারে। সাহেবের সম্পর্কে ও রকম সুইপিং রিমার্ক করা মোটেই ঠিক হয়নি। সাহেব আমাদের কতদিনের পুরনো কমরেড, কতকাল আমরা এক পথে হাঁটছি...। সাহেবের তিন তিনটে অনুবাদ তো আমরা করেওছি। সেগুলো হয়তো তখন চলেনি, কিন্তু তা বলে তো সাহেব খাটো হয়ে যায় না ! হয়তো এবার না করলাম, নেক্সট্‌বারই আমরা সাহেবের লেখা কিছু একটা নিয়ে...

নির্মল বাঁকা চোখ তাকাল, —তার মানে অন্য কোনও নাটক হবে না, এটা আগে থেকেই স্থির হয়ে গেছে।

—শান্ত হও, শান্ত হও। বাসবেন্দ্র হাত তুলল,—তুমি না এইমাত্র বললে আমাদেব গ্রুপে ডেমোক্রেসি চলে ! আমিও জানি আমাদের দলের মতো ডেমোক্রেসি কোনও গ্রুপে নেই...

—তো ? নির্মলের ভুরু জড়ো হল।

—ডেমোক্রেসিই ঠিক করুক কোন্ প্রোডাকশানটা হবে। সদস্যরা ভোট দিয়ে চয়েস জানাক।

শুভেন্দু ভেতরে ভেতরে এরকমই একটা প্রস্তাব আঁচ করছিল। এই মুহূর্তে বাসবেন্দ্রকে দেখে মনে মনে পীড়িতও হচ্ছিল খুব। কত কাছের মানুষ কত সহজে অচেনা হয়ে যায়।

আহত ভাবটা লুকোতে পারল না শুভেন্দু। তীক্ষ্ণ গলায় বলল,—তুমি কি বলছ তার মানে জানো বাসবেন্দ্র ? ভোট দিয়ে নাটক সিলেকশান করবে ?

—দোষের কী আছে ? মেজরিটির মতই গ্রাহ্য হওয়া উচিত। আমরা বেশি দিন আছি বলে আমাদের ইচ্ছে জোর করে কারুর ওপর চাপিয়ে দিতে পারি না।

শুভেন্দু অস্ফুটে বলল,—আমাদের এতদিনের জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা, এত কাণ্ড করে গড়ে তোলা নাট্য আন্দোলন, সব মিথ্যে ? সত্যি শুধু ভোট ?

—এবং সেই ভোট, যেটা আগে থেকে ম্যানিপুলেট করা আছে। নির্মল শ্লেষের সুরে বলল, —চমৎকার। আবার বলি ঔরঙ্‌জেব, চমৎকার।

—মুখ সামলে নির্মল। বাসবেন্দ্র দুম করে গলা চড়াল,—তুমি কিন্তু আমায় ইনসাল্ট্ করছ। আমি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে বদলাতে পারছি, গ্রুপের সকলের চিন্তাভাবনা আমার সঙ্গে মিলছে, এটা আমার দোষ ? নাটকের জন্য তোমাদের চেয়ে আমি কম মুভমেন্ট করেছি ? তোমাদের চিন্তাভাবনা এখনও একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে, অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন্ ইউ

আর সাসপেক্টিং ইওর ওল্ড কমরেড।

—বটেই তো। নির্মলের ঠোঁটে শাণিত ব্যঙ্গ—কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কতটা বদলাবে বাসবেন্দ্র ? গ্রুপটাকে প্রফেশনাল বোর্ড করে ফেলবে ?

—এগেইন অ্যান ইন্‌সাল্টিং কমেন্ট। তুমি জানো, প্রফেশনাল বোর্ডে কত বড় বড় ব্যক্তিরা কাজ করে গেছেন ?

—এবং তুমিও জানো আমি তাঁদের ইনসাল্ট করছি না। আই ডু রেসপেক্ট দেম, কিন্তু আমাদের পথ আলাদা। এন্টারটেনমেন্টকে তাঁরা এক চোখে দেখেছেন, আমরা আর এক চোখে। আমাদের একটা ইজম্ ছিল। আমরা নাটকের মধ্যে দিয়ে কোথাও একটা পৌঁছতে চেয়েছিলাম। সেই গোলটা বক্স অফিস নয়। আমাদের নিজস্ব কিছু বলার আছে, সেটাকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরার আছে...

—মানে আর কী, মুক্তাঙ্গন যোগেশ মাইম কিংবা বয়েজ ওউন হলের কাউন্টারে বসে বসে মাছি তাড়ানো, তাই তো ? সুজিত টুকুস টিপ্পনী কেটে উঠল, —তখন বছরে কটা কল'শো করতেন, নির্মলদা ?

—ব্যাটেলিয়ান একেবারে ফিট, অ্যাঁ ? এবার মেজরিটি যদি পতির কোলে সতী চায়, তাই করবে তো বাসবেন্দ্র ? নির্মলের গলাও চড়ে গেছে।

আবার গোলমাল শুরু হয়ে গেল। এক সঙ্গে অনেকে উঠে এসেছে বাসবেন্দ্রর টেবিলের সামনে, চেঁচাচ্ছে উত্তেজিত মুখে। বাসবেন্দ্রর মুখ লাল, চোয়ালে চোয়াল ঘষে চুপ করতে বলছে সকলকে। তার মুখ দেখে কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায় এই মুহূর্তে সভাটা যে নিয়ন্ত্রণহীন, এটাই তার অভিপ্রেত ছিল।

নির্মল ব্যাগ কাঁধে উঠে দাঁড়িয়েছে, তারও দৃষ্টিতে আগুন। ফুটন্ত গলায় বলল,—বাসবেন্দ্র, চলি তাহলে। তুমি তোমার নিজস্ব বাহিনী নিয়ে গ্রুপ চালাও।

শুভেন্দু কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না, মস্তিষ্কের একটি কোষও যেন কাজ করছে না এখন। এই তার নাট্যজগৎ? তার ত্রিভুবন ? এর জন্য সে ঘর সংসার চাকরি সব উপেক্ষা করেছে ? ঢেলে দিয়েছে সমস্ত উদ্যম ?

নির্মলের ডাকে হুঁশ ফিরল। ঘর ছাড়ার আগে নির্মল সামনে এসে কাঁধে হাত রেখেছে, —কী সাহেব, তুমি কি এখনও বসে থাকবে ?

সম্মোহিতের মতো উঠে পড়ল শুভেন্দু। বেরিয়ে রাস্তাতেও পৌঁছয়নি, মেয়েলি ডাকে ঘুরে তাকিয়েছে। তাপসী। বাসবেন্দ্রর স্ত্রী। অন্যান্য মিটিং-এ কিছু না কিছু বলে তাপসী, আজ সারাক্ষণ চুপ করে ছিল।

নির্মল গোমড়া মুখে বলল,—তোমার আবার কী দরকার পড়ল আমাদের ?

—তোমরা কি সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছ নির্মলদা?

—নয় তো কি ঘাড় ধাক্কা দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত ছিল?

ফর্সা মধ্যবয়স্ক তাপসীর মুখমণ্ডলে ছায়া। অনুচ্চ স্বরে বলল,— তোমরা কিছু বেঠিক বলোনি। আমাদের আগের নাটক-কটা তাও যুক্তি বুদ্ধির ভেতরে ছিল, সামান্য হলেও তাতে মেসেজ ছিল কোনও।...... কিন্তু দিস ইজ টু মাচ। ওই

রংমশাল উপন্যাস ' আমি পড়েছি। নেহাতই বাজারচলতি নভেল। ট্র্যাশ। সমিধকে নিয়ে অলরেডি কানাকানি শুরু হয়ে গেছে, রংমশাল নামালে অনেকেই ছি ছি করবে।..... কিন্তু প্রবলেমটা কী হয়েছে জানো? বাসবেন্দ্রর মাথায় ঢুকে গেছে, গ্রুপটাকে আরও বড় করতে হবে। একটা বিশাল ছাতার মতো প্রতিষ্ঠান হবে সমিধ।

—ভালই তো। তোমরা ছাতার নীচে রইলে।

—ঠাট্টা করছ? স্ট্রিট লাইটের আলো কৌণিক ভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে তাপসীকে। তার মুখের কিছুটা আলোয়, কিছুটা অন্ধকারে। আর একটু এগিয়ে এল তাপসী। ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল, —বাসবেন্দ্রকে আমি অনেক বুঝিয়েছি নির্মলদা। 'আদর্শের সঙ্গে আপস মানুষকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে না। আলটিমেটলি যেখানে পৌঁছনো যায়, সেটা তার ডেসটিনেশান ছিল না।'

—কথাগুলো তো তুমি ঘরেই বলতে পারতে।

—-লোক হাসাতে ভাল লাগে না।

—তাহলে এখনই বা বলতে এলে কেন?

—এলাম। আমি তো শুধু বাসবেন্দ্রর বউ নই, আমি তো তাপসীও। যে তাপসী সমিধের জন্ম-মুহূর্ত থেকে সঙ্গে সঙ্গে আছে। অ্যাক্টিং ট্যাক্টিং হয়তো তেমন করিনি, তোমাদের টুল চেয়ার তো এগিয়ে দিয়েছি! হেসে। ভালবেসে। মন থেকে। আজ গ্রুপের প্রত্যঙ্গ খসে গেলে আমার কষ্ট হবে না? তাপসী শুভেন্দুর চোখে চোখ রাখল,— তোমরা বোধহয় ঠিকই করেছ সাহেবদা। একটাই শুধু রিকোয়েস্ট, বসে যেও না।

তাপসী ফিরে যাচ্ছে। শিথিল, অন্যমনস্ক পায়ে। মলিন আবছায়া মাড়িয়ে। একটুক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল দরজায়। ঢুকে গেল।

নির্মল, শুভেন্দু হাঁটা শুরু করেছে। খানিকটা গিয়ে নির্মল ঝেঁঝে উঠল, —ন্যাকামোটা দেখলে?

শুভেন্দু বলল,— ন্যাকামি বলছ কেন? তাপসী তো সত্যিই নিজের ফিলিংটা জানিয়ে গেল।

—ডোন্ট টক রাবিশ। তুমি বিশ্বাস করতে বলো তাপসী জানত না আজ এই সাজানো নাটকটা অভিনীত হবে? যার লাস্ট সিন আমাদের এগজিট? তাপসী জাস্ট বাসবেন্দ্রর হয়ে আমাদের প্যাসিফাই করতে এসেছিল। বাসবেন্দ্ররই শেখানো পড়ানো কথা.....

—নাও তো হতে পারে। কেন তাপসীকে আমরা অবিশ্বাস করব?

—তুমি আর বদলালে না সাহেব। সব কিছু সাদা চোখে দেখা এবার ছাড়ো। আজকের টোটাল প্যান্ডেমোনিয়ামটার কারণটা কিছু আন্দাজ করতে পেরেছ?

—হ্যাঁ, ওরা ফো-র নাটক করতে চায় না। ওরা কমার্শিয়াল হয়ে গেছে।

—কাঁচকলা বুঝেছ। নির্মল জোরে জোরে মাথা নাড়ল,—ওটাকে ইস্যু করেছিল বটে, কিন্তু ওটাই মেন নয়। সেকেন্ড অ্যাজেন্ডামটা কী ছিল মনে

আছে? সদস্যদের আচরণবিধির পর্যালোচনা। ওটা আমিই জোর করে ঢুকিয়েছিলাম। বাসবেন্দ্রর ইচ্ছের বিরুদ্ধে। বাসবেন্দ্র ভাল মতো জানে ওই প্রসঙ্গটা উঠলে নিজেকেই ওর ডিফেন্ড করার জায়গা থাকবে না। ইয়াং ছেলেমেয়েগুলো টিভিতে চান্স পাওয়ার জন্য সারাক্ষণ স্টুডিওপাড়ায় ঘোরাঘুরি করছে, রিহার্সাল স্কিপ করে যাচ্ছে, বাসবেন্দ্র ওদের কিচ্ছুটি বলতে পারে না। কোন মুখে অ্যাজেন্ডামটা তুলবে বাসবেন্দ্র?

—হুঁ। শুভেন্দু শুকনো হাসল,—এখন আমরা আউট হয়ে গেলাম। সবাই এখন মুক্ত বিহঙ্গ।

—সব চেয়ে বড় আয়রনিটা দেখলে? যে বাসবেন্দ্র একদিন ভোটের রাজনীতিতে বিশ্বাস করত না, সে এখন নিজের দলে ভোট চালু করতে চায়।

শুভেন্দু বিড়বিড় করে বলল,—দোষটা হয়তো আমাদেরই। একটু একটু করে ক্ষমতা বাড়ছিল বাসবেন্দ্রর। যেখানেই ছুটতে হোক, যাকেই মিট করতে হোক, বাসবেন্দ্র আছে। দেখেও তো আমরা চোখ বুজে থেকেছি। আমরা নিজেরা কিছু করিনি। ভেবেছি, বেশিটাই যখন ও পোহাচ্ছে, নয় ক্ষমতাও বেশি ভোগ করুক। কিন্তু ও যে একদিন গোটা দলটাকে ম্যানুভার করে পুরো ওয়ান ম্যানস্ টিম বানিয়ে ফেলবে, এটা ভাবতে পারিনি।

—ভাবা উচিত ছিল। আমি তো কত বারই ভোকাল হতে চেয়েছি, তুমি আমায় চুপ করিয়ে দিয়েছ। নির্মল দাঁতে দাঁতে ঘষল,—পাওয়ার কোরাপ্টস্। অ্যাবসোলিউট পাওয়ার কোরাপ্টস অ্যাবসোলিউটলি। ও এখন স্বচ্ছন্দে অটোক্রেসিটা ডেমোক্রেসির মোড়কে মুড়ে লোকসমক্ষে তুলে ধরবে।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ চলে এসেছে দুজনে। ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে গলি, গলি পেরিয়ে রাজপথ, আবার গলি, আবার ট্রামরাস্তা। পার হয়ে যাচ্ছে ভিড়, পথের আলো কমছে বাড়ছে কমছে। বৈশাখী সন্ধ্যা রাতের দিকে গড়িয়ে চলল, টের পাচ্ছে না দুই বন্ধু। হাঁটছে। এখন বড় নিঃশব্দ এই পথ চলা।

শুভেন্দু বুকে একটা চাপ অনুভব করছিল। মস্তিষ্ক আবার অবশ ক্রমশ। আজ হোক, কাল হোক, নন্দিতা তো জানবেই, কী বলবে? নাটক থেকেও ভলানটারি রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেল? উফ্, কী সুতীক্ষ্ণ পরিহাস সহ্য করতে হবে শুভেন্দুকে। নিজের আয়নাতেই বা কোন মুখ দেখতে পাবে শুভেন্দু? একজন সম্পূর্ণ পরাজিত বিতাড়িত মানুষ....একটা ক্ষয়ে যাওয়া আত্মা! বেঁচে থাকাটাই কী অর্থহীন এখন। উপায় একটা আছে। নিঃশর্তে নন্দিতার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করা। পাথর হয়ে, ঘাস হয়ে জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেওয়া। মাস দুয়েকের মধ্যে পি এফ ছাড়া বাকি টাকাটা হাতে এসে যাবে। মোটামুটি সাড়ে তিন লাখ। নন্দিতার কথা মতো একটা ব্যবসা ট্যবসা নয় শুরু করে দেবে। তিন্নির বিয়ের জন্যও অবশ্য রাখতে হবে কিছু টাকা......

অকস্মাৎ থমকে দাঁড়াল শুভেন্দু। কতক্ষণ হেঁটেছে? এ কোথায় এসে পড়েছে তারা? সামনে তো গঙ্গা। ওই তো কাশী মিত্তিরের ঘাট। চমকে পাশে তাকাল

শুভেন্দু। নির্মলও কেমন অবাক মুখে স্থির।

নির্মলও তাকাল শুভেন্দুর দিকে। হঠাৎই স্থান-কাল-পাত্র ভুলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে। হাসতে হাসতে বলল,— মনে পড়ে কবে প্রথম এখানে এসেছিলাম?

শুভেন্দু মাথা নাড়ল,—হ্যাঁ। দুজনেই একটা পত্রিকায় কবিতা পাঠিয়েছিলাম, দুজনেরটাই অমনোনীত হয়েছিল। মনের দুঃখে কফিহাউস থেকে হাঁটতে হাঁটতে.....।

—লং থারটিথ্রি ইয়ার্স এগো। কী একটা গান আছে না, প্রতিটি লাইনের শেষে লং লং এগো.....? এ যেন ঠিক তেমনি, তাই না?

শুভেন্দু করুণ হাসল।

—ডাজ ইট মিন এনিথিং সাহেব?

—কোনটা?

—এই আমাদের এখানেই এসে পড়াটা? মনে হচ্ছে না, একটা ইনার ফোর্স আমাদের ড্রাইভ করে নিয়ে এল?

শুভেন্দু ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাল।

—মনে আছে, সেদিন এই গঙ্গার ধারে বসে আমরা কী ঠিক করেছিলাম?

মনে আছে শুভেন্দুর। নদীর পাড়ে বসে তারা কোরাসে গেয়েছিল, উই শ্যাল ওভারকাম.....। কী অসম্ভব শক্তি পেয়েছিল সেদিন। রাতে বাড়ি ফিরেই আবার কবিতা লিখতে বসেছিল।

কিন্তু সেই শুভেন্দু আর এই শুভেন্দু কি এক মানুষ?

মলিন স্বরে, শুভেন্দু বলল,—মনে রাখা মানে তো শুধু কষ্ট পাওয়া।

—তা কেন? আমাদের এখানে আসাটাই বলে দিচ্ছে, আবার আমাদের নতুন করে শুরু করতে হবে।

—কী শুরু করব?

—আমরা নতুন গ্রুপ ফর্ম করব।

—শুধু দুজন মিলে?...। আমি লিখব, তুমি অ্যাক্টিং করবে, আমি লাইট ফেলব, তুমি ড্রপ টানবে....।

—ডোন্ট বি পেসিমিস্ট ম্যান। নির্মল পিঠ চাপড়াল শুভেন্দুর, —এত বছরে কি আমরা কিচ্ছু শিখিনি? আট দশটা ইয়াং ব্লাডকে আমরা দলে টানতে পারব না? আমি শিওর বিশ্বজিৎ আর সুকান্ত আমাদের সঙ্গে চলে আসবে। আজ সামনাসামনি ওরা বাসবেন্দ্রকে ডিফাই করতে পারেনি, বাট অ্যাট হার্ট ওরা আমাদের সঙ্গেই আছে। ইনফ্যাক্ট, পরশু আমার বিশ্বজিতের সঙ্গে কথাও হচ্ছিল। আমার ইনটিউশান বলছে, বিশাখাও আসবে। গ্রুপ শুরু করতে পাঁচ জনই যথেষ্ট। সমিধের যখন গোড়াপত্তন হল, তখন আমরা কজন ছিলাম সাহেব?

—বয়সটা তখন বাইশ বছর কম ছিল নির্মল। মাঝে শরীরের কোটি কোটি

সেল্ নষ্ট হয়ে গেছে।

—ওতে কিচ্ছু আসে যায় না। তিপ্পান্ন পঞ্চান্ন বছর বয়সটা নতুন লাইফ শুরু করার জন্য এমন কিছু লেট নয়।

শুভেন্দু চুপ করে গেল। পায়ে পায়ে গঙ্গার পাড়টিতে এসেছে। কাশী মিত্তিরের ঘাট একটুখানি দূরে, এ জায়গাটা বেশ নির্জন। কাঠের গুঁড়ি পড়ে আছে একটা, শুভেন্দু গুঁড়িটায় বসল।

নির্মলও পাশে এসে বসেছে। সিগারেট ধরাল, শুভেন্দুকেও দিল। গলা ঝেড়ে বলল,—তোমার অনুবাদের কাজ কদ্দুর?

—গোটা চারেক সিন বাকি।

—শোনাও একদিন।

শুভেন্দু আলগা ভাবে নির্মলের হাতে চাপ দিল,—সে আর হয় না। বাদ দাও।

—কেন হয় না সাহেব?

—আমাকে এবার শান্ত নিরুদ্বিগ্ন অবসরজীবন যাপন করতে দাও।

সোনালি করমর্দনের কাহিনী এই সবে গত সপ্তাহে নির্মলকে খোলসা করে বলেছে শুভেন্দু, তথাপি শুভেন্দুর কথাটাকে নির্মল গ্রাহ্যই করল না। বলল,—সে তুমি পারবেই না।

—পারতেই হবে। নন্দিতাকে সুখী তো করতে পারলাম না, এবার অন্তত একটু স্বস্তি দিই।

—কেন এত ভেঙে পড়ছ বলো তো? বুঝতে পারছ না তোমার এখনও অনেক কিছু দেওয়ার আছে, করার আছে.....। কথায় বলে লাইফ বিগিনস অ্যাট ফরটি। তার মানে তুমি এখনও কৈশোর পেরোওনি।

—তুমি দেখি একদম আমার তিন্নির মতো কথা বলছ!

—স্বাভাবিক। আমার মনের বয়স এখনও যে তিন্নির বয়সের থেকে কম। নির্মল হাসছে। হাসতে হাসতেই শুভেন্দুর পিঠে হাত রাখল আবার,—কী সাহেব, আমরা তাহলে নতুন দল গড়ছি?

শুভেন্দু হ্যাঁ না কিছুই বলল না। থেকে থেকে বুকের মধ্যে রক্তের কল্লোল জাগছে আবার হঠাৎই কেঁপে কেঁপে উঠছে হাঁটু। নদীর ওপারটায় আলো, এপারেও, মাঝখানে তরল আঁধার। ভাটা চলছে, ঠেলে ঠেলে উজান স্রোতে নৌকো বাইছে এক মাঝি। আলো ঝলমল একটা লঞ্চ চলে গেল, ঢেউয়ে নৌকো টলমল। সিল্যুয়েট নৌকা আবার এগোচ্ছে। ধীরে ধীরে। দুলতে দুলতে।

শুভেন্দু দোদুল্যমান নৌকোটাকে দেখছিল। নিষ্পলক চোখে।

সাত

ভরদুপুরে তন্নিষ্ঠাকে দেখে অবাক হয়ে গেল কোয়েল,—কী রে, তুই হঠাৎ?

তন্নিষ্ঠা ঠোঁট টিপে হাসল,—তোর অফিস দেখতে এলাম।

—খুব ভাল করেছিস। আয়, বোস। কোয়েল খোলা স্টেপকাট চুল ঝাঁকাল, আঙুল তুলে বলল, —এক সেকেন্ড।

হাতলঅলা বেঁটে ঘুরনচেয়ারে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পাক খেল কোয়েল। সামনে রাখা কম্পিউটারের কি টিপছে টকাটক, দৃষ্টি স্থির পর্দায়। থামছে মাঝে মাঝে, ঝটাঝট প্রিন্টআউট বেরোচ্ছে, আলগা চোখ বুলিয়ে কাগজগুলো জড়ো করছে টেবিলের এক পাশে।

গদিআঁটা হাতলবিহীন চেয়ারে বসতে বসতে তন্নিষ্ঠা অফিসটাকে দেখে নিল একবার। ছোট, তবে ভারী ছিমছাম সাজানো অফিস, দেওয়াল মেঝে সব একেবারে ঝকঝকে তকতকে, কোথাও এতটুকু ধূলিকণার চিহ্নমাত্র নেই। খোলা জায়গায় পর পর বিন্যস্ত টেবিলে জনা পনেরো কর্মী, বেশির ভাগই তরুণ তরুণী, কাজ করছে অখণ্ড মনোযোগে। কোয়েলের মতো আরও কয়েক জনের টেবিলে কম্পিউটার, সেখানেও চলছে শব্দ সংখ্যা আর অক্ষরের খেলা। প্রান্তে প্লাইউড ঘেরা ঘরও আছে দু তিনটে। একটা ঘর থেকে সবুজ বুশসার্ট পরা এক মধ্যবয়সী লোক ব্যস্তসমস্ত মুখে বেরিয়ে এল। একটা টেবলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এক রাশ প্রিন্টআউট হাতে আবার ঘরে ঢুকে গেল। গোটা অফিসে চড়া এসি চলছে, বেজায় ঠাণ্ডা। কে বলবে বাইরে এখন প্রখর বৈশাখ?

প্রিন্টআউটের স্তূপ পেপারওয়েটে চাপা দিয়ে তন্নিষ্ঠার দিকে ফিরেছে কোয়েল,—বল্? কী খবর?

প্রাইভেট অফিসের কর্মব্যস্ত রূপ দেখে অস্বস্তি হচ্ছিল তন্নিষ্ঠার। বলল, তোকে ডিসটার্ব করলাম না তো?

—আরে দূর। টেবিলে রাখা পেনসিল তুলে কোয়েল হালকা ঠুকছে,—কেমন দেখছিস আমাদের অফিস?

—এ ওয়ান। দু আঙুলে মুদ্রা করল তন্নিষ্ঠা।

—খাটায়ও খুব। কোনওদিন সাতটা আটটার আগে বাড়ি ফিরতে পারি না। বলতে বলতে চোখ ছোট করল কোয়েল,—তুই সত্যি সত্যি আমার অফিস দেখতে এসেছিস?

তন্নিষ্ঠা হাসি হাসি মুখে বলল,— কলেজ সার্ভিস কমিশনের অফিসে এসেছিলাম। ভাবলাম সামনেই তোর অফিস, একবার ঢুঁ মেরে যাই।

কোয়েল এক সেকেন্ড থমকাল। পরমুহূর্তে চোখ গোল গোল, —ও হ্যাঁ, আজ তো তোদের স্লেট পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। পেয়ে গেছিস?

তন্নিষ্ঠা চোখ বন্ধ করে ঘাড় নাড়ল,— লেগে গেছে।

—কনগ্র্যাট্স্। হাত বাড়িয়ে দিল কোয়েল। তন্নিষ্ঠার হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে

বলল, — হোয়াট আ গ্রেট নিউজ! একটা ট্রিট দে।

—আরে দাঁড়া, সবে তো রিটন্ গেল, এর পর ইন্টারভিউ আছে, তাতেও তো ছেঁটে যেতে পারি।

—কক্ষনও না। বড় গাঁটটা যখন পেরিয়েছিস, তখন ওটাও উতরে যাবি। .... কবে ইন্টারভিউ?

—সেটা জানতেই তো এসেছিলাম। ভ্যাৎ, কেউ কিছু বলতেই পারে না। কেউ বলে তিন মাস, কেউ বলে ছ মাস, কেউ উত্তরই দেয় না।... তবে মনে হয় পুজোর আগেই ইন্টারভিউ বোর্ড বসবে।

—তুই চাকরিটা পেলে আমাদের ব্যাচের সাত জন কলেজে যাবে । আমাদের ব্যাচটা কী রকম ভাল ছিল বল্?

তন্নিষ্ঠা সামান্য সঙ্কুচিত বোধ করল। কোয়েল ছ নম্বরের জন্য ফিফ্‌টি ফাইভ পারসেন্ট পায়নি, বেচারা কোনওদিন স্লেট পরীক্ষায় বসার চান্স পাবে না।

কোয়েল জিজ্ঞাসা করল,— আঁখির কী হল রে?

—বুঝতে পারছি না।

—ফোন করিসনি?

—ভেবেছিলাম করব, তারপর.... যদি এবার ওর না হয়ে থাকে! বেচারার লাকটাই খারাপ। গতবার পরীক্ষা দিতে দিতে অসুস্থ হয়ে পড়ল....

—দিন পনেরো আগে একদিন দেখা হয়েছিল। বলল, এবার স্লেট না পেলে স্কুল সার্ভিস কমিশনে বসে যাবে।

—কিন্তু ওর মতো অ্যাকাডেমিক মাইন্ডেড মেয়ের কলেজটাই বেশি স্যুট করত। এম ফিল করে নিত, রিসার্চে জয়েন করত....। তা ছাড়া ওরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ সেম প্রফেশানেও থাকতে পারত।

—হাজব্যান্ড বলিস্ না, বল্ হচ্ছে হবে হাজব্যান্ড।

—ওই হল।

আলাপচারিতায় ছেদ পড়ল। একটা পিওন গোছের লোক এসেছে কোয়েলের কাছে, কোয়েল তাকে প্রিন্টআউটগুলো গুছিয়ে দিল। টেবিল টেবিলে কফি দিয়ে যাচ্ছে আর একটা লোক, কোয়েলের টেবিলেও এসেছে।

দুটো কফি নিল কোয়েল। গরম প্লাস্টিক গ্লাস তন্নিষ্ঠাকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, —নে, তুই তো কিছু খাওয়ালি না, আমিই তোকে মিষ্টিমুখ করাই।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে তন্নিষ্ঠা বলল, তুই কিন্তু একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছিস কোয়েল । মালার বউভাতের দিন তোরা কথা দিলি আমাদের বাড়ি আসবি, খাওয়া দাওয়া করবি, এক সঙ্গে ডে-স্পেন্ট করব.....!

—হয়ে ওঠে না রে। সারা সপ্তাহ গাধার খাটুনি, একটা মাত্র ছুটির দিন, বাড়িতে এত কাজ থাকে .... শেখরও আর নড়তে চায় না...

কাজ, না বাহানা? বিয়ের পর শেখর বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে গেছে, আপনি-কোপনির সংসারে কী এত কাজ থাকে?

কোয়েল বলল, —রাগ করিস না, এবার একদিন ঠিক চলে যাব। ..... মাসিমা মেসোমশাই কেমন আছেন রে?

—ওই একরকম। বাবার তো অফিস থেকে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক হয়ে গেল.....

—সে কী! কবে?

—এই তো জুনেই বাবার লাস্ট...। কিছু টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে কোম্পানি খালাস।

কোয়েল এক সেকেন্ড কী যেন ভাবল। বলল, — তোর মা সার্ভিস করেন না?

উত্তর দেওয়ার আগেই আবার আলাপচারিতায় ছন্দপতন, পিওন গোছের লোকটা ফের এসেছে, —শর্মা সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

কোয়েল শশব্যস্ত, —আমি একটু আসছি রে। বস কলিং।

কোয়েল উঠে দাঁড়িয়েছে। তন্নিষ্ঠা বলল, —তোর অফিস থেকে একটা ফোন করা যাবে?

চোখ টিপল কোয়েল, — শৌনককে?

—হ্যাঁ রে। সকাল থেকে তিন বার ওকে ট্রাই করেছি, খালি এনগেজড্। সুখবরটা ওকে জানিয়ে দিই।

—কর, কিন্তু বেশিক্ষণ না। টেলিফোন তন্নিষ্ঠাকে এগিয়ে দিয়ে কোয়েল প্রায় ছুট লাগাল।

বান্ধবীর রাধা-ভাবে আপন মনে হাসল তন্নিষ্ঠা। প্রাইভেট কোম্পানির চাকরিতে বড় যাঁতা! উফ্, কলেজটা যদি লেগে যায়।

খুশি খুশি মুখে টেলিফোনের বোতাম টিপল তন্নিষ্ঠা। যাক, রিং হচ্ছে।

ওপারে শৌনকেরই গলা, —রায়চৌধুরী হিয়ার।

তন্নিষ্ঠার গলা খাদে, — আমি বলছি।

—ও, তন্নিষ্ঠা! হোয়াট আ কোইন্সিডেন্স। আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। হয়তো এক্ষুনি তোমায় ফোন করতাম।

—কেন?

—সুখবর আছে। আমার একটা ইন্টারভিউ এসেছে। দিল্লি থেকে।

—তাআআই? কোথায়?

—মিলার ইন্ডিয়া। কস্‌মেটিকস জগতে যাদের ভুবনজোড়া নাম।

—যাদের নাইটিঙ্গেল পারফিউম?

—হতে পারে। ওরা তো ওসবই ম্যানুফ্যাকচার করে। তোমাদের যত রকম লিপস্টিক নেলপলিশ এট্‌সেট্রা এট্‌সেট্রা...

—কবে ইন্টারভিউ?

—কামিং ফ্রাইডে। আমি পরশুর রাজধানী ধরব। ওরা রাজধানী টু টায়ারের ফেয়ার দিচ্ছে। ...তুমি আমার হয়ে একটু প্রে করবে তো?

—করব। তন্নিষ্ঠা নরম করে বলল। এক সেকেন্ড থেমে থেকে স্বরে উচ্ছ্বাস আনল একটু, —আমারও একটা সুখবর আছে। আমি স্লেটের রিট্‌নে পাশ করেছি।

—তাই নাকি? বাহ্ বাহ্। এই জানো, এরা কিন্তু আমায় খুব বড় পোস্টের জন্য ডেকেছে। ডেপুটি চিফ। খোঁজখবর করে যা জানলাম পে অ্যারাউন্ড থ্রি পয়েন্ট সিক্স প্লাস প্লাস...। যদি চান্সটা লেগে যায় কত বড় হাইক হবে ভাবতে পারো?

তন্নিষ্ঠা ছোট্ট করে বলল, —সে তো বটেই।

—ভেবেছিলাম আজ সন্ধেবেলা তোমাদের ওখানে যাব, হচ্ছে না। এক্ষুনি আমায় হাইড রোড ছুটতে হবে। প্ল্যান্টে। আমার চেনা এক ট্রাভেল এজেন্টের কাছেও যেতে হবে। পরশুর টিকিট তো...! তেমন হলে অবশ্য ফ্লাইট ধরে নেব।

—ও।

—এখন রাখি, কেমন? সুইট ড্রিম।

—হুঁ।

টেলিফোন রেখে দিয়ে কয়েক সেকেন্ড কোয়েলের কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে রইল তন্নিষ্ঠা। আত্মমগ্ন চোখে। খবরটা তো আনন্দেরই, তবু তেমন উৎফুল্ল হতে পারছে না কেন? শৌনকটা যেন কী, তন্নিষ্ঠার সুসংবাদটা শুনলই না ভাল করে!

কোয়েল হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে, —এই তনু, কিছু মনে করিস না প্লিজ। আমায় এখন একটু বসের ঘরে থাকতে হচ্ছে। বেশিক্ষণ লাগবে না। আধঘন্টা মতন। তুই বসবি?

—না রে, চলি আজ। তন্নিষ্ঠা দাঁড়িয়ে পড়ল, — আসিস কিন্তু একদিন। শেখরকে নিয়ে।

বাইরে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে পুড়ছে। মাঝে কটা দিন বেশ ছিল, দিনভর গরমের পর সন্ধেবেলা কালবৈশাখী আসছিল রোজ, সাত আট দিন হল মেঘেরা পুরোপুরি উবে গেছে। রাত নটার আগে সিমেন্টের দেওয়াল পর্যন্ত শীতল হয় না। একটাই বাঁচোয়া, গরমটা এখন শুকনো, ঘাম প্যাচপেচে নয়।

পথে বেরিয়ে কোনও দিকে তাকাল না তন্নিষ্ঠা, সোজা পাতালে নামল। মেট্রো রেলের সেন্ট্রাল স্টেশনে। এখান থেকে মেট্রোতেই তার সুবিধে। টালিগঞ্জে নেমে অটো ফটো কিছু একটা ধরে রানিকুঠি।

দুপুরের ট্রেনে তেমন একটা ভিড় নেই। চাঁদনিচকেই বসার জায়গা পেয়ে গেল তন্নিষ্ঠা। পাতালেও এখন বেজায় গরম, তবু বসাটুকুই যা শান্তি। ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে ঘাড় গলা মুছল, এলোমেলো এদিক ওদিক চোখ চালাচ্ছে। হঠাৎই দূরে চেনা মুখ। বাসবেন্দ্রকাকু না?

বাসবেন্দ্র হাত নেড়ে নেড়ে এক ফ্রেন্চকাট দাড়ির সঙ্গে গল্প করছে। ওই মুখটাও যেন তন্নিষ্ঠার হাল্কা চেনা! মনে পড়েছে, টিভিতে দেখা মুখ। বাসবেন্দ্রর

সঙ্গে একবার চোখাচোখি হল তন্নিষ্ঠার, আলতো হাত নেড়েই চোখ সরিয়ে নিয়েছে বাসবেন্দ্র। এসপ্ল্যানেডে লোক উঠেছে কিছু, পার্ক স্ট্রিট ময়দানের পর কামরায় হাল্কা ভিড় ভিড় ভাব, বাসবেন্দ্র তন্নিষ্ঠার চোখের আড়ালে।

তন্নিষ্ঠা বসে আছে স্থির। মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছে। ঘোষিকার যান্ত্রিক স্বর পীড়া দিচ্ছে কানে। কেন যে এরা স্পিকারটা সারায় না!

কালীঘাট স্টেশনে অনেক লোক নামল। বাসবেন্দ্রও এই গেটের দিকে এগিয়ে এসেছে। নামার পূর্ব-মুহূর্তে তন্নিষ্ঠাকে বলল, —এই তিন্নি, তোর বাবাকে একবার ফোন করতে বলিস তো। বাড়িতে।

তন্নিষ্ঠা ঘাড় নাড়ার আগেই বাসবেন্দ্র প্ল্যাটফর্মে, ট্রেনের দরজা বন্ধ।

তন্নিষ্ঠার একটু অদ্ভুত লাগল। এতক্ষণ বাসবেন্দ্রকাকু মাত্র আট দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, স্বচ্ছন্দে আগেই বলতে পারত....! নাটকের লোকেরা কি নাটুকে কায়দা ছাড়া কথা বলতে পারে না?

বাড়ি ফিরে তন্নিষ্ঠা ঘুমিয়ে পড়েছিল। চোখ খুলল ডোরবেলের আওয়াজে। কমলা এসেছে। বাসন কোসন মাজবে, রাতের খানাও বানিয়ে ফেলবে এখন।

বসার ঘরে এসে টিভি চালিয়ে দিল তন্নিষ্ঠা। সিনেমা। হিন্দি। তবু চোখ থেকে ঘুম ছাড়ছে না, ঘন ঘন হাই উঠছে।

গলা ওঠাল, —কমলাদি, এক কাপ চা খাওয়াবে?

—দিই। .....খাবার খাবে কিছু?

—নাহ্। ভাল্লাগছে না।

চা খেয়ে একটু বুঝি আলস্য কাটল। সিনেমাটাও জমে উঠেছে বেশ। পুরনো দিনের ছবি, রোমান্টিক। গানগুলো ভারী সুরেলা। দেখতে দেখতে ক্রমে তন্ময় হয়ে পড়ছিল তন্নিষ্ঠা।

নন্দিতা ফিরল সাতটা নাগাদ। দু হাত ভর্তি প্যাকেট, দু চোখে খুশির ঝিলিক। একটা প্যাকেট ডাইনিং টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, —তিন্নি, তোর জন্য চিকেন পকোড়া এনেছি। আয়, গরম গরম খেয়ে নে।

ছবিটা ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে করছিল না তন্নিষ্ঠার, তবু উঠে এল। একটা চিকেন পকোড়া মুখে ফেলে বলল, — এটা কি আমার প্রাইজ?

—শুধু তোমার নয়, শৌনকেরও প্রাইজ। ধরে নাও তুমি শৌনকের হয়েও খাচ্ছ।

—আমারটা তো বুঝলাম, শৌনকের কী জন্য?

—শৌনক তোকে রিঙ করেনি? বীথিকাদি তো আমায় অফিসে টেলিফোন করে বলল খুব ভাল একটা কোম্পানিতে ইন্টারভিউ পেয়েছে শৌনক....

—ও, এই কথা। তন্নিষ্ঠা বিচিত্র মুখভঙ্গি করল। বিদ্রূপ নয়, উপেক্ষাও নয়, মজাও নয়, অথচ সব কিছু মেশানো। হেসেই বলল,— তাও তো চাকরিটা এখনও পায়নি!

—সে তো তুমিও পাওনি। তোমার জন্য যদি আনন্দ হয়, ওর জন্য কেন হবে

না?

তন্নিষ্ঠা মাথা দোলাল,—এ যুক্তি জজে মানে বটে।

অন্য দিন এই গরমে নন্দিতা বাড়ি ফিরেই স্নানে ঢুকে যায়, আজ সেদিকে গেলই না। মেয়ের চিকেন পকোড়া ভক্ষণ শেষ হতে না হতেই তাকে টেনে নিয়ে এসেছে ঘরে। বিছানায় পড়ে থাকা প্যাকেট দুটোর দিকে আঙুল দেখাল,—খোল্। দ্যাখ পছন্দ হয় কি না।

—কী আছে ওতে?

—শাড়ি। একটা কাঞ্জীভরম, একটা ওয়ালকালাম।

প্যাকেট খুলে প্রায় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে তন্নিষ্ঠার। ওয়ালকালামটা ময়ূরকণ্ঠী, কাঞ্জীভরম টিয়ারঙ্। কী অপূর্ব!

তন্নিষ্ঠা আহ্লাদী গলায় বলল,—এত দামি শাড়ি হঠাৎ কিনতে গেলে কেন মা? তোমার কি পয়সা কামড়ায়?

—অফিসের সুষমাদি সাউথ ইন্ডিয়ান হ্যান্ডলুম হাউসের কার্ড করিয়ে দিয়েছে একটা। পোস্ট-ডেটেড চেক দিতে হয়েছে। বারো মাসের। গায়ে লাগবে না। ... বিয়ের শাড়ি এখন থেকেই স্টক করতে হবে, বোঝো না?

—সে তো তুমি আগেই অনেকগুলো কিনেছিলে!

—আরও নয় দুটো হল। বড়লোকের ঘরে যাবে, ওরা যেন মনে কোনও খেদ না রাখে। এমনিই তো মানসী বলছিল, বীথিকাদি নাকি তোকে ঢেলে দিচ্ছেন। গয়না শাড়ি.....একটা মাত্র ছেলের বউ.....মানসী বলছিল তোকে নাকি হিরের সেটও দেবে বীথিকাদি।

মানসী নন্দিতার স্কুলজীবনের বন্ধু, এখন এক নামী ডাক্তারের গৃহিণী। শৌনক-তন্নিষ্ঠার সম্বন্ধটা মানসীই করে দিয়েছে। বীথিকার সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়, এক সঙ্গে নানা রকম সমাজ সেবামূলক কাজ করার সূত্রে।

অনবরত বিয়ের প্রসঙ্গ আজ ভাল লাগছিল না তন্নিষ্ঠার। তবু বলল,—তুমি কি ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাইছ মা?

—সে ক্ষমতা আমার কোথায়! নন্দিতা ফোঁস করে শ্বাস ফেলল,—তাও তোর বাবা যদি একটু অন্য রকম মানুষ হত ....! এখন তো আমার মাথায় দুশ্চিন্তা ঢুকে গেছে কী করে বিয়েটা তুলব!

মার ওপর মায়া হচ্ছিল তন্নিষ্ঠার, বাবার ওপরও। দুটো সম্পূর্ণ পৃথক মেরুর মানুষ কেন যে তাকে এক সঙ্গে ভাবায়! দুটো মেরুই কি তার মনের কুঠুরিতে বাসা বেঁধে আছে!

ঈষৎ ভারাক্রান্ত বুকে তন্নিষ্ঠা আবার সোফায় এসে বসল। রিমোট হাতে পুট পুট টিভির চ্যানেল ঘোরাচ্ছে। কোনও প্রোগ্রামই পছন্দ হচ্ছে না, বন্ধ করল টিভি। একটা ম্যাগাজিন খুলে পাতা ওল্টাতে শুরু করল।

ফোন বেজে উঠেছে। নন্দিতা বাথরুমে ঢুকছিল, তাড়াতাড়ি এসে রিসিভার তুলল। একটা দুটো কথা বলেই ডাকছে,—তিন্নি, তোর ফোন।

—কে?

—কোয়েল।

কোয়েল? তন্নিষ্ঠা আশ্চর্য হল। ফোন তুলে কোয়েলের দুপুরের বিস্ময়টাই ফিরিয়ে দিল কোয়েলকে,—কী রে, তুই হঠাৎ?

—শেখর তোকে কী বলবে।

—কী রে?

—শোন্‌ই না।

শেখর ফোন নিয়েছে,—এই তনু, তোর বাবার কেসটা শুনলাম।

—বাবার? কী কেস?

—ওই যে....চাকরি থেকে.....

—ও হ্যাঁ....বাবাকে ওরা রিটায়ার করিয়ে দিয়েছে।

—আমি বলছিলাম.....মেসোমশাই কী রকম টাকাপয়সা পাচ্ছেন রে?

—কেন বল্ তো? তন্নিষ্ঠার কিছুই মাথায় ঢুকছিল না।

—না ....উনি টাকাটা নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও রাখবেন....আই মিন ডিপোজিট করবেন?

—হয়তো করবে। তো?

—যদি করেনই, আমাদের কথাও ভাবতে পারিস। মানে আমাদের কোম্পানির কথা। জানিসই তো, আমরা খুব সিকিওরড্ অরগ্যানাইজেশান। রেট অফ ইন্টারেস্টও খুব ভাল। থারটিন পারসেন্টের ওপর। প্লাস, আমার থ্রু দিয়ে ইন্‌ভেস্ট করলে একটা অ্যাডভানটেজ আছে। এজেন্টের কমিশনের ফিফ্‌টি পারসেন্ট আমি মেসোমশাইকে দিয়ে দিতে পারব। ইনসেন্‌টিভ আর কী।

তন্নিষ্ঠার বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিল না। কী ধান্দাবাজ ছেলে রে! তার বাবা, তরতাজা প্রাণবন্ত একটা মানুষ, মাত্র তিপ্পান্ন বছর বয়সে চাকরি থেকে হুটআউট হয়ে গেল, তাই নিয়ে শেখরের বিন্দুমাত্র সমবেদনা নেই, প্রথম চিন্তাই হচ্ছে ওই টাকাটা থেকে কী ভাবে দু পয়সা রোজগার করে নেওয়া যায়? কয়েক লাখ টাকা ডিপোজিট দেখিয়ে কোম্পানিতেও বাহবা কুড়োবে? একেই কি প্র্যাকটিকাল হওয়া বলে?

শেখর ও প্রান্তে ছটফট করছে,—কী রে, চুপ করে গেলি কেন?

তন্নিষ্ঠা নীরস স্বরে বলল,—আমি কী বলব? ওসব বাবা জানে।

—আমি কি গিয়ে মেসোমশায়ের সঙ্গে কথা বলব?

—সে তোর ব্যাপার, তুই বোঝ্।

—হুম, তাহলে তো তোর ওখানে একদিন যেতে হয়। সারাদিন চুটিয়ে আড্ডা মারা যাবে, মেসোমশায়ের সঙ্গে কাজের কথাটাও সেরে ফেলব ....। তুই মেসোমশাইকে একটু বলে রাখিস কিন্তু।

—উঁ।

—কবে যাব? এই রোববার?

তন্নিষ্ঠা গলা আরও শুকনো করে বলল,—আসতে পারিস, বাবার সঙ্গে দেখা হবে কি না বলতে পারছি না। বাবা রোববার সারাদিনই গ্রুপে থাকে।

—তাহলে কোনও একদিন অফিস ফেরতা? একটু রাতের দিকে?

—কদিন পরে আসিস। তন্নিষ্ঠা প্রাণপণ চেষ্টায় গলায় ঝাঁজটা চেপে রেখে বলল,—বাবাকে অন্তত রিটায়ারটা করতে দে।

—ও কে। অল রাইট। দেখিস, অন্য কাউকে যেন আবার....। আমরা কিন্তু রিয়েলি খুব সিকিওরড্ কোম্পানি, মাথায় রাখিস। ছাড়ছি, অ্যাঁ?

ফোনটা কেটে যাওয়ার পর চোরা বিবমিষা জাগছিল তন্নিষ্ঠার। ওই ঘ্যানঘেনেপনাটাই কি সাফল্যের চাবিকাঠি? একেই কি জান লড়িয়ে দেওয়া বলে? এত আবেগহীন হয়ে, অন্যের মনঃকষ্টকে উপলব্ধি না করে, কোথায় পৌঁছতে চায় মানুষ? কী পেতে চায়?

তন্নিষ্ঠা আবার নিজের ঘরে গিয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। এ মুহূর্তে তার মনেই পড়ে না, আজ সকালটা ভারী সুন্দর শুরু হয়েছিল। এক একটা দিন যে কত ভাবে রং বদলায়!

একটা তন্দ্রা তন্দ্রা ঘোর এসেছিল, তার মধ্যেই মার গলা শুনতে পেল তন্নিষ্ঠা। খেতে ডাকছে। উঠল, যন্ত্রমানবীর মতো এসে বসল টেবিলে। শুভেন্দুও এসে গেছে, সেও খাচ্ছে। মাথা নিচু করে, নীরবে।

নন্দিতাই টুকটাক কথা বলছিল। পাতে খাবার তুলে দিচ্ছে, কেউ আর কিছু নেবে কি না জিজ্ঞাসা করল, বাজার থেকে কাল ছোট চিংড়ি আনতে বলল শুভেন্দুকে, অফিস যাওয়ার আগে কাল লাউচিংড়ি করবে, কমলার রুটি করা নিয়েও রুটিনমাফিক বিরূপ মন্তব্য করল কিছু....। শুভেন্দু খেয়ে উঠে চলে গেছে, তখনও চলছে খুচখাচ কথা। মাঝে মাঝে হুঁ হ্যাঁ করছিল তন্নিষ্ঠা। শুনেও শুনছিল না।

খাওয়া দাওয়ার পর টিভি চালিয়েছে নন্দিতা। অভ্যাস মতো টুকুন পাশে বসেছিল তন্নিষ্ঠা, রঙিন পর্দায় শূন্য দৃষ্টি রেখে। খানিক পর উঠে চলে গেল। ঘরে ঢুকতে গিয়ে চোখ পড়েছে ব্যালকনিতে। শুভেন্দু চেয়ার টেনে বসে সিগারেট খাচ্ছে।

কী মনে করে তন্নিষ্ঠা ব্যালকনিতে এল। শুভেন্দুকে বলল,—তুমি আজকাল একটু বেশি সিগারেট খাচ্ছ বাবা?

শুভেন্দু যেন অন্য গ্রহে ছিল। ধড়মড় করে মর্তে ফিরল,—আমি? কই না তো!

—তুমি এ সময়ে সিগারেট খাও না বাবা। আমি অন্তত দেখিনি।

—আজ ইচ্ছে করছে।

—ও। ... দুপুরে কখন বেরোলে আজ?

—ওই তো, বারোটা সাড়ে বারোটার পর।

—অফিস যাওনি?

—গেছি। থাকিনি বেশিক্ষণ।

ব্যালকনিতে হেলান দিয়ে শুভেন্দুর সামনে দাঁড়াল তন্নিষ্ঠা। একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে এখন, নরম বাতাস, চোখ বুজে তন্নিষ্ঠা বাতাসটাকে মাখছিল।

হঠাৎ চোখ খুলে বলল,—বাবা জানো, আজ বাসবেন্দ্রকাকুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

শুভেন্দু যেন চমকে উঠল,—কখন? কোথায়?

—মেট্রো রেলে। বাসবেন্দ্রকাকু যা একটা কাণ্ড করল না ...! সারাক্ষণ কাছে দাঁড়িয়ে রইল, তখন কিছু বলল না ... ট্রেন থেকে নামছে, দরজা বন্ধ হচ্ছে, তখন হঠাৎ ...। তন্নিষ্ঠা বাসবেন্দ্রর গলা নকল করল,—এই তিন্নি, তোর বাবাকে একবার ফোন করতে বলিস তো! বাড়িতে! সঙ্গে বাসবেন্দ্রকাকুর একজন কো-স্টার ছিল। টিভির। ... তুমি কিন্তু ফোন কোরো, নইলে বাসবেন্দ্রকাকু ভাববে আমি তোমায় বলতে ভুলে গেছি।

—হুম্।

—বাসবেন্দ্রকাকু কি রোজ রিহার্সালে আসে না? দেখা হয় না তোমার সঙ্গে?

—কয়েক দিন হয়নি। জ্বলন্ত সিগারেটখানা টোকা দিয়ে ছুড়ে ফেলল শুভেন্দু, একবার ঝুঁকে দেখল কোথায় পড়েছে। পুরো নেবেনি সিগারেট, আগুনের লাল আভা দেখা যাচ্ছে অন্ধকার মাখা ঘাসে। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সামান্য গলা তুলে বলল,—ও হ্যাঁ, তোকে বলা হয়নি। তুই বেরিয়ে যাওয়ার পর তোর একটা ফোন এসেছিল।

—কার ফোন?

—কী যেন নাম বলল একটা? ... হ্যাঁ হ্যাঁ, অভিমন্যু।

হঠাৎই যেন বুকটা তিরতির করে উঠল তন্নিষ্ঠার। বলল,—কিছু বলেছে?

—খবরের কাগজে স্লেটের রেজাল্টটা বেরিয়েছে দেখে ... আমি বলে দিয়েছি তুই রিট্নে পাশ করে গেছিস।

এই চমকটাও আজ পাওনা ছিল? হলুদ রাধাচূড়া ফুল্‌গুলোর দিকে তাকাল তন্নিষ্ঠা। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে হঠাৎ। পদ্মকাঁটা।

আট

কারখানায় ঢুকতেই খারাপ খবর। কাল বিকেলে আবার নাকি অমূল্যবাবু এসেছিল। অনেকক্ষণ ধরে গজগজ করে গেছে, সেন্টের গন্ধে আর নাকি টেকা যাচ্ছে না!

সাতসকালেই অভিমন্যুর মেজাজটা তেতো হয়ে গেল। অমূল্য কুণ্ডু মনামি কেমিক্যাল্‌সের বাড়িঅলা। এমনিতে মানুষটা নিপাট ভদ্রলোক, সম্প্রতি রেলের চাকরি থেকে রিটায়ার করেছে, এক সময়ে অভিমন্যুকে এই ব্যবসায় খুব উৎসাহ দিয়েছিল, তবে ইদানীং তার সুর একটু অন্য রকম। মাঝে মাঝেই এসে

গোবিন্দদের কাছে ওই এক অভিযোগ জানিয়ে যাচ্ছে। অভিমন্যুর অনুপস্থিতিতে।

একটু দোনামোনা করে আজ দোতলায় গেল অভিমন্যু,—মেসোমশাই, প্রবলেম কী হয়েছে?

অমূল্য কুণ্ডু টিভি সিরিয়াল দেখছিল। উঠে এসে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল,—দ্যাখো বাবা, ভুল বুঝো না।...তোমার এই কারখানা নিয়ে আমি যে ঝঞ্ঝাটে পড়ে যাচ্ছি!

—কেন, অসুবিধে কী হল? আমি তো কাজের সময় জানলা টানলা সব বন্ধ রাখি, আমার পারফিউমের গন্ধ তো আপনার দোতলায় পৌঁছয় না!

—একদম পৌঁছয় না কী করে বলছ? তবে হ্যাঁ, আমরা সহ্য করে নিই। যত অসুবিধেই হোক। তোমার মাসিমা বলে, ছেলেটা যখন এত উদ্যম নিয়ে কিছু একটা করছে...। কিন্তু পাড়াপড়শিরা যে বড় অশান্তি শুরু করেছে বাবা।

—কিন্তু আমার কারখানা তো এখানে নতুন নয় মেসোমশাই? এ গন্ধ তো আগেও ছিল!

—তখন তুমি অল্পস্বল্প বানাতে। এখন তোমার কাজের ভল্যুম বেড়েছে...। এই তো পরশুই পাশের বাড়ির রণেনবাবু রাস্তায় ধরে ঝুড়ি ঝুড়ি কথা শুনিয়ে দিল। তার ছেলের বউয়ের গন্ধে অ্যালার্জি, সেন্টের ঝাঁঝে নাকি হাঁপানির টান উঠছে।

আশ্চর্য, দিনের পর দিন সামনের কাঁচা ড্রেন থেকে ভকভক গন্ধ ওঠে, প্রায়শই করপোরেশনের লোক খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পাঁক তুলে রাস্তায় ছড়িয়ে রেখে যায়, সে সব দিব্যি হজম হয়ে যায়, অভিমন্যুর সেন্টেই যত অ্যালার্জি।

অভিমন্যু বিনীত ভাবেই বলল,—কিন্তু করবটা কী বলুন?

—কারখানাটা অন্য কোথাও নিয়ে গেলে হয় না? এই, কোনও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ফেস্টেটে?

—বললেই তো জায়গা পাওয়া যাবে না মেসোমশাই। একে ওকে ধরতে হবে, মোটা টাকা ঢালতে হবে...। ঠিক আছে, কটা দিন সময় দিন।

—হ্যাঁ, দ্যাখো। বোঝই তো হেলথ্‌গ্রাউন্ডে কেউ কমপ্লেন ঠুকে দিলে বিপদে পড়ে যাব। পাড়ার মধ্যে কারখানা...

অভিমন্যু আর কথা না বাড়িয়ে নেমে এল। নতুন একটা চিন্তা ঢুকল মাথায়। অমূল্যবাবু যা শোনাল, তা এক ধরনের নোটিশই। পাড়াপ্রতিবেশী যদি সত্যিই না চায়, তাহলে তো ছাড়তেই হবে। কোথায় খুঁজবে ঘর? টালিগঞ্জে করুণাময়ীর দিকে সন্ধান করলে হয়তো...। দেখা যাক কী করা যায়।

ভাবনাটাকে আপাতত মুলতুবি রেখে কাজে মন বসানোর চেষ্টা করল অভিমন্যু। মালতী আজ দেরিতে আসবে বলে গেছে। বাচ্চার অসুখ। গোবিন্দ একা একা পারফিউমের বাক্স বানাচ্ছে। অভিমন্যু ডাকল তাকে,—কী কী মাল লাগবে লিস্ট করেছিস?

—এই তো। গোবিন্দ পকেট থেকে কাগজ বার করে এগিয়ে দিল, —আপনি একবার দেখে নিন অভিদা।

তালিকায় চোখ বোলাল অভিমন্যু। বেনজিন, মাসক্ কিটোন, স্যান্টালোল, লিনালুল...মোটামুটি ঠিকই আছে। পকেট থেকে পার্স বার করে গুনতে গুনতে প্রশ্ন করল,— ইথাইল অ্যালকোহল কতটা আছে রে?

—পাঁচ লিটারের একটু বেশি।

—আর ডিস্টিল্ড্ ওয়াটার?

—আছে মোটামুটি। দিন পনেরো চলে যাবে।

—গুড। আমি তাহলে বেরোচ্ছি। মার্কেট হয়ে বাড়ি থেকে একেবারে খেয়ে টেয়ে ফিরব।

ঢাউস কিট্‌স ব্যাগ কাঁধে এখন বাসে ওঠা ভারী কঠিন। সবে সাড়ে দশটা বাজে, যানবাহনের এখন বস্তাবোঝাই দশা। বেশ খানিকক্ষণ কসরতের পর কোনক্রমে একটা মিনিবাসের পা-দানিতে নিজেকে প্রবেশ করাতে পারল অভিমন্যু। ঠেসাঠেসি গুঁতোগুঁতিতে হাঁসফাঁস করছে ভেতরটা, গরমে প্রায় সেদ্ধ হওয়ার জোগাড়।

তার মধ্যেই অবিরাম গলা ফাটাচ্ছে ছোকরা কন্ডাক্টার,—পিছনে এগোন...পিছনে বাড়ুন...

তারাতলার মোড়ে দু-চারটে লোক নেমেছে, ঠেলেঠুলে অভিমন্যু ওপরে উঠল একটু। এত চাপেও রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারছে না। বলল,— পেছন দিকে কী করে এগোনো যায় রে ভাই?

ওমনি কোত্থেকে আলগা টিপ্পনী,—দেশ তো এখন পেছন দিকেই এগোচ্ছে দাদা!

কন্ডাক্টার ঠাট্টা ইয়ারকির ধার ধারে না। টেরিয়া ভঙ্গিতে বলে চলেছে,—কী হচ্ছে কী দাদা? গেটের সামনে গ্যাঞ্জাম করছেন কেন?

—যাব কোথায় রে ভাই? পিঁপড়ে গলার জায়গা আছে?

—জায়গা থাকে না মোওয়াই, জায়গা করে নিতে হয়।

বটেই তো, বটেই তো। লড়াই করে করে এগোতেই সত্যি-সত্যি সামনেটা দিব্যি ফাঁকা! পুরো একটা মানুষ এঁটে যেতে পারে!

অভিমন্যু হ্যান্ডেল আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে। খেলনা টাইম মেশিনের মতো ছুটছে বাস, উদ্দাম ঝাঁকুনির সঙ্গে ক্রমাগত অভিমন্যু ব্যালেন্স করে চলেছে নিজেকে। রেসকোর্সের কাছাকাছি এসে হঠাৎই দৃষ্টি নিথর।

জানলার ধারে ও কে বসে? মুখ বাইরে ফেরানো?

তন্নিষ্ঠা না?

অভিমন্যুর হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। হ্যাঁ তো, তন্নিষ্ঠাই তো! ওই রকমই রেশম রেশম চুল, ওই রকমই রাজহংসী-গ্রীবা, ওই রকম গালের আদল! কিন্তু এখানে কী করে এল তন্নিষ্ঠা, এই বাসে? কখন উঠল? এসেছিল কোথায়?

কোথায়ই বা চলেছে? ঘাড় ফিরিয়ে দেখে যদি...কেমন হবে তন্নিষ্ঠার মুখভাব? অবাক অবাক? খুশি খুশি? ইশ্, সেদিন পারফিউমটার কথা বলা হয়নি, আজ বলতে হবে।

কন্ডাক্টার কর্কশ স্বরে টিকিট চাইছে, মেয়েটি ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে অভিমন্যু হতাশ। তন্নিষ্ঠা তো নয়ই, তন্নিষ্ঠার বয়সীও কেউ নয়। নিখাদ দিদিমণি দিদিমণি চেহারার এক বিবাহিত মহিলা। অধ্যাপিকা হয়ে গেলেও তন্নিষ্ঠা কক্ষনও ওরকম হাঁড়িমুখো হবে না।

চড়া সূর্য প্রখর তাপ ছড়াচ্ছে। ময়দান এসে গেল। বাইরে সবজেটে গাছগাছালি, তবু বাতাসে এতটুকু কোমলতা নেই এখন। মনে হয় যেন উষ্ণ নিশ্বাস ফেলছে পৃথিবী।

অভিমন্যুও একটা নিশ্বাস ফেলল। তপ্ত। বাষ্পময়। অঘটন আজকাল আর ঘটে না।

বি-বা-দী বাগে নেমে অভিমন্যু ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল। কর্মব্যস্ত শহরে এখন অন্তহীন যানবাহনের স্রোত, পেরোচ্ছে লম্বা লম্বা পায়ে।

সহসা পিঠে শক্ত থাবা,—কী রে অভি, চললি কোথায়?

ভাস্কর। অভিমন্যুর এক্স এমপ্লয়ার। একদা বাবার ছাত্র ছিল বলে অন্য এক ধরনের ঘনিষ্ঠতাও আছে অভিমন্যুর সঙ্গে। দাদা ভায়ের সম্পর্কের মতো।

আজ ভাস্করের সঙ্গে দেখা না হলেই কি হত না?

অভিমন্যু বেশ অসহজ বোধ করল। দেঁতো হেসে বলল,—এই তো...এদিকেই...

—তোকে বার বার খবর পাঠাচ্ছি, দেখা করছিস না কেন?

কেন আহ্বান জানে অভিমন্যু। মোটামুটি পয়সাঅলা ঘরের ছেলে ভাস্কর, কেমিস্ট্রির ছাত্র ছিল, এম-এস-সি করে বড় সড় এক ল্যাবরেটরি খুলেছে বেন্‌টিঙ্ক স্ট্রিটে। অবাঙালি পার্টনার নিয়ে। একটা মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিংয়ের গোটা ফ্লোর জুড়ে ভাস্করের অফিস কাম পরীক্ষাগার। কোয়ালিটি কন্ট্রোলের কাজই বেশি আসে সেখানে। ছোটখাটো বা মাঝারি ব্যবসায়ী, যাদের গুণমান নিয়ন্ত্রণের নিজস্ব পরীক্ষাগার নেই, তারাই প্রধানত ভাস্করদের ক্লায়েন্ট। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের লাইসেন্স আছে, দেশে বিদেশে ভাস্করদের ল্যাবরেটরির সার্টিফিকেট বিশেষ মূল্যবান। অভিমন্যুকে আবার সেখানেই ফেরাতে চায় ভাস্কর।

অভিমন্যু নিজেকে গুছিয়ে নিল। মুখে হাসিটা ধরে রেখেই বলল,—একদম সময় পাচ্ছি না ভাস্করদা।

—কীসের এত ব্যস্ততা? তোর সেই পারফিউমের ব্যবসা? এখনও করছিস?

—টিকে আছে।

—তার মানে চলছে না ভাল?

—মোটামুটি চলছে। ধরছে আস্তে আস্তে।

—কী রকম থাকে হাতে?

—বলার মতো কিছু নয়।

—নিজে ব্যবসা করার বখেড়া কী বুঝছিস তো?

ভাস্কর কথাগুলোকে কোন দিকে ঠেলছে, বুঝতে পারছিল অভিমন্যু। সতর্ক স্বরে বলল,—বখেড়া তো জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আছে ভাস্করদা, একটু দেখে বুঝে চলতে হয়।

—বুঝছিস এ কথা? এখন বুঝছিস? তোর সেলট্যাক্স আছে, ইনকামট্যাক্স আছে, হেলথ্ লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স, ই এস আই, পরিবেশ দূষণ...সব ঠিকঠাক করছিস তো? নাকি পয়সা গুনছিস?

ভাস্করের বলার ভঙ্গি চ্যাটাং চ্যাটাং হলেও কোথায় যেন একটা সাদামাঠা সুর আছে। অভিমন্যু রাগতে গিয়েও রাগল না। বলল,—তুমি কী বলতে চাও পষ্টাপষ্টি বলো তো! ঝেড়ে কাশো।

—সবই তো জানিস। এক কথা কত বার বলব! ভাস্কর অভিমন্যুর কাঁধে হাত রাখল,—মিছিমিছি তেজ দেখিয়ে কাজ ছেড়ে দিলি।...ওসব শতেক ফ্যাচাং ঘাড় থেকে নামিয়ে ফ্যাল্। চলে আয় ল্যাবরেটরিতে।

অভিমন্যু দু এক সেকেন্ড দেখল ভাস্করকে। তারপর মুখের ওপরই বলল,—কেন কাজ ছেড়েছিলাম, তুমি তো সেটা ভালই জানো ভাস্করদা। আমার পোষায় না। পার্টি এসে টাকা গুঁজে দিয়ে যাচ্ছে, মাল টেস্ট না করেই তাদের চাহিদা মতো সার্টিফিকেট তৈরি হয়ে যাচ্ছে...। টেস্টিংয়ের নাম করে ওখানে যা চলে তা তো ফ্রড।

—তোর কী? তোর তো ঠিকঠাক মাইনে পেলেই হল। ভাস্কর কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল। আহত গলায় বলল,—আর একদম টেস্ট হয় না, এটা কি তুই ঠিক বললি? একেবারে কিছুই না করলে আমাদের বি এম ল্যাবরেটরির এত গুডউইল থাকত?

—কী করে গুডউইল আর্ন করছ, তাও তো আমি জানি ভাস্করদা। গভর্নমেন্টের লোকগুলোকে তাজ গ্র্যান্ড গ্রেট ইস্টার্নে পার্টি দিচ্ছ, দেদার মদ গেলাচ্ছ,...। আরও যা যা হয়, নাই বা বললাম।

—তুই কিন্তু একটু বেশি অফেনসিভ কথা বলছিস অভি।

—আমাকেই বা ঘাঁটাচ্ছ কেন? আমাকে ছাড়াই তো তোমাদের দিব্যি চলছে...। চালিয়ে যাও।

এতক্ষণ ভাস্করের মুখে বেশ চালিয়াত চালিয়াত ভাব ছিল, এবার যেন পল্কা ছায়া পড়েছে,—একটু প্রবলেম হচ্ছে বলেই তোকে...। ইনফ্যাক্ট, দু এক দিনের মধ্যে আমি তোর বাড়ি যেতামও। আফটার অল্ তুই স্যারের ছেলে, আমার নিজের লোক...

অভিমন্যু ঈষৎ উদ্বিগ্ন হল, —কেন? ফেঁসেছ নাকি কোথাও?

—দূর, আমি অত কাঁচা কাজ করি না।...আসলে নতুন কয়েকটা কেমিস্ট জয়েন করেছে, বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, কিন্তু ত্যাঁদোড়ের ঝাড়। কাজকর্ম কিছুই জানে

না, কথায় কথায় শাসায়, বাম্বু দিয়ে দেব...!

—স্যাক করে দাও।

—তার কিছু মেটিরিয়াল অসুবিধে আছে রে। জানিসই তো, আমাদের কিছু সিক্রেট ব্যাপার ট্যাপার থাকে। এই কোম্পানির খবর ওই কোম্পানিতে চালান করে দিলে...!

—কিছু মনে কোরো না ভাস্করদা, মালিক বাঁকা পথে চললে কর্মচারীরাও সোজা থাকে না।

—পিউরিটানের মতো কথা বলিস না তো। আজকের দুনিয়ায় আবার বাঁকা পথ সোজা পথ কী রে? ভাস্কর উত্তেজিত হতে গিয়েও সামলে নিল,—ওসব ডগ্মা স্টিগ্মাগুলো ঝেড়ে ফ্যাল। চলে আয়। আমি তোকে চিফ কেমিস্ট করে দেব। তোর মতো অনেস্ট ছেলে মাথার ওপর থাকলে আর কেউ ট্যাঁ ফোঁ করতে পারবে না।

—অর্থাৎ আমাকে তোমাদের শিল্ড্ হতে হবে, তাই তো?

—না করিস না অভি, জয়েন করে যা। রাকেশও তোকে ভীষণভাবে চাইছে।...শোন্, কাজের ধারা সব পাল্টে ফেলব। নো জালি, নাথিং। সব এক নম্বরে হবে।

নির্ঘাত বি এম ল্যাবরেটরি ভাল মতন লটকেছে কোথাও! গঙ্গাজল মেখে শুদ্ধ হতে চাইছে! অভিমন্যু মনে মনে বলল, তোমরা চেষ্টা করলেও তা আর পারবে না ভাস্করদা। আজ লোক দেখানো কাজ করবে, কাল থেকেই...। টাকা কামানোর শর্টকাট রাস্তায় একবার ঢুকে পড়লে, সেটাই রক্তে মজ্জায় মিশে যায়। ওই গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা বড় কঠিন।

মুখে বলল,—আমায় ছেড়ে দাও ভাস্করদা। চাকরিকে যখন একবার কুইট করেছি, আর ও পথ মাড়াব না। আমার ছোটমোট বিজনেসই ভাল। আই নিড হ্যাপিনেস।

হ্যাপিনেস শব্দটা যেন ভাস্করের কোনও গোপন তন্ত্রীতে আঘাত করল, পলকের জন্য ফ্যাকাশে হয় গেছে তার মুখ। অভিমন্যু ভাসা ভাসা শুনেছিল ভাস্করদার সঙ্গে গোপাবউদির কী সব গণ্ডগোল চলছে। বোধহয় মামলার দিকেও এগোচ্ছে সম্পর্কটা। ভাস্করদা তো আর খুব শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবন যাপন করে না!

পলকের গ্লানি পলকে মুছে ফেলেছে ভাস্কর। ঠোঁট উল্টে বলল,—নাহ্, তুই বদলাবি না।...যাক গে যাক, স্যার কেমন আছেন? কাকিমা?

—ওই একরকম। বাবা পেনশানের জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে...। মার শরীরও গোলমাল করছে একটু, ডাক্তার দেখাতে হচ্ছে।

—আর উপমন্যু?

—আছে।...বেঁচে আছে।

—কোথায় আছে? ওই মানকুন্ডুতেই?

—হুঁ। এই তো দিন আট দশ আগে ঘুরে এলাম।

—ডাক্তাররা হোপ দিচ্ছে না কোনও?

—নাহ্।

—পুওর সোল। অভিমন্যুর কাঁধে আবার হাত রাখল ভাস্কর,—চলি রে। যাব একদিন স্যারের কাছে। এমনিই যাব।

ভাস্করের গমনপথের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মন্থর পায়ে হাঁটা শুরু করল অভিমন্যু। ভাস্করদা মানুষটা ভারী অদ্ভুত। ভেতরে একটা সারল্য আছে, আবার কখনও কখনও কী ভয়ানক জটিল! জীবনের কেমিস্ট্রিটা বুঝি একটু বেশি বদহজম হয়ে গেছে ভাস্করদার।

ট্রামরাস্তা পেরিয়ে অভিমন্যু রাধাবাজার স্ট্রিটে ঢুকল। শহরের এই রাস্তাটা তার বড় প্রিয়। দু ধারে সার সার ঘড়ির দোকান। চলমান সময়। স্থির সময়। এই পথ পেরনোর সময়ে ভারী রোমাঞ্চ বোধ করে অভিমন্যু। মনে হয় যেন কাল সরণি ধরে হাঁটছে।

একটা দোকানে অদ্ভুত সুন্দর এক পেন্ডুলাম দুলছে, দেখতে একটু দাঁড়িয়েছিল অভিমন্যু, দুম করে আবার হৃৎপিণ্ডে লাবডুব।

দোকানে অমন মাথা নেড়ে নেড়ে কথা বলে কে?

আসমানিরঙ সালোয়ার কামিজ, ফিরোজারঙ ওড়না? রেশমি চুল উদাস উড়ছে হাওয়ায়?

তন্নিষ্ঠা রাধাবাজারে কেন? সময় কিনতে?

ডাকবে অভিমন্যু? নিয়ে যাবে তন্নিষ্ঠাকে গন্ধের মায়াপুরীতে?

ডাকবে, নাকি পাশে গিয়ে চমকে দেবে?

কিছুই করতে হল না। মেয়েটা ঘুরে দাঁড়াতেই অভিমন্যু ছিটকে সরে গেছে। কী বিশ্রী ব্রণ ভর্তি মুখ, ঠোঁটে চড়া লিপস্টিক, চোখে ধ্যাবড়া কাজল! তন্নিষ্ঠাকে নামীদামি বিউটিপার্লারও অত কুৎসিত করে সাজাতে পারবে না!

আবার ছোট্ট শ্বাস পড়ল অভিমন্যুর। অঘটন সত্যিই আর আজকাল ঘটে না।

রাধাবাজারে দু একটা সেন্টের দোকান আছে বটে, তবে মূল দোকান সব এজ্‌রা স্ট্রিটে। আসগর আলির দোকানটাই বড়, এখান থেকেই কেনাকাটা সারে অভিমন্যু।

কাউন্টারে যথারীতি ক্রেতার মেলা। বেশির ভাগই ছোটখাটো সুগন্ধি প্রস্তুতকারক। অভিমন্যু সেখানে দাঁড়াল না, পাশের গলি দিয়ে ঢুকে গেছে অন্দরে।

সঙ্কীর্ণ কুঠুরিতে বসে আছে আসগর আলি। বৃদ্ধ মানুষ, টকটকে লাল রং, টিকোলো নাক, ধবধবে সাদা দাড়ি, মাথায় ফেজ। অভিমন্যুর সঙ্গে আসগর আলির দিব্যি বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ক্ষুদ্র পারফিউম ব্যবসায়ীদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম, অভিমন্যু তাদের তুলনায় অনেক বেশি কেমিক্যালসের নাম জানে, তাদের গুণাগুণও, হয়তো বা সেই কারণেই।

অভিমন্যুর স্লিপ কাউন্টারে পাঠানোর আগে আসগর আলি দেখে নিল

একবার। স্মিত মুখে বলল, —তা মজুমদারবাবু, আপনার মাল মেটিরিয়ালসের অর্ডার বাড়ে না কেন?

—কেন, এবার তো মাসক্ কিটোন বেশি নিচ্ছি।

—কই বেশি! কারবার একটু বাড়ান এবার।

—কী হবে? এই তো বেশ চলছে।

—উহুঁ। চলছে বটে, কিন্তু চলবে না। ব্যবসায় টিকে থাকতে গেলে আপনাকে বাড়তেই হবে। আসগর আলি আতর মাখানো দাড়িতে হাত বোলাল, —হয় কমা, নয় বাড়া, কারবারে কোনও মাঝরাস্তা নেই। থামলেই হয় আপনাকে পেছনের লোক ধাক্কা মেরে চলে যাবে, নয়তো সামনের লোক আপনাকে মাড়িয়ে পিষে দেবে। বুঝলেন?

—হুম্।

—শুধু কারবার কেন, জীবনেরও এই নিয়ম। কোথাও থেমে থাকার জো নেই। আসগর আলি মিটিমিটি হাসছে, —শাদি তো করেননি, করলে বুঝবেন।

অভিমন্যু হেসে ফেলল। বুড়োর এখনও রস আছে। ভাবল একবার বলে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আরও একজন দুজন সেলস্ম্যান নেওয়ার কথা মাথায় ঘুরঘুর করছে। থাক, সত্যি সত্যি এখনও কোনও কিছু মনস্থ করে উঠতে পারেনি, আগ বাড়িয়ে ঘোষণা করার কী দরকার! সমীরণ ছুটি থেকে ফিরে মেদিনীপুর গেছে, দেখা যাক ওখানে কদ্দূর কী হয়। তেমন সুবিধে করতে না পারলে সমীরণকেই নয় নর্থ বেঙ্গল টেঙ্গল...

অন্য কথায় এল অভিমন্যু। দাড়ি চুলকে বলল, —আলি সাহেব, একটা নতুন পারফিউম বানাব ভাবছি...। দামি।

—বানান, বানান। আসগর আলি সোৎসাহে বলল, —মার্কেটে তো এখন দামি মালেরই ইজ্জত বেশি।

—হুঁ।...ইলাং ইলাং-এর কিছু আছে আপনার?

—এখন সাপ্লাই নেই। কম চলে তো, আনাই না। বলেন তো কেল্কারের কাছে খোঁজ করতে পারি।

—দেখবেন তো একটু।...ভাবছি, এটাতে সিভেটোন ফিক্সেটিভ দেব। অরিজিনাল সিভেটোন হবে আপনার কাছে?

—চাইলেই হবে। এখন তো সবাই সিন্থেটিক দিয়েই সস্তায় বাজিমাৎ করতে চায়...। ঢক ঢক মাথা দোলাচ্ছে আসগর আলি। সপ্রশংস চোখে বলল, —ভাল আইডিয়া। আপনার কারবার বাড়বে। দুনিয়ায় নতুন একটা খুশবু যদি আনতে পারেন...

নতুন সৌরভের জন্যই তো মানুষের বেঁচে থাকা। মনে মনে কথাটা আওড়াল অভিমন্যু। আরও দু একটা টুকিটাকি কেজো সংলাপ সেরে কিট্সব্যাগ কাঁধে বেরিয়ে পড়ল। বাসে না উঠে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছে এস্প্ল্যানেড। কাল মাকে নতুন ওষুধ দিয়েছে ডাক্তার। এখন মা মোটামুটি স্বাভাবিক, কথা বলছে,

হাসিখুশি আছে, তবু যেন চোরা আনমনা ভাবটা রয়েই গেছে, এই বদলি ওষুধটা খুব জরুরি, কাল বেহালার কোনও দোকানে পাওয়া যায়নি।

ধর্মতলা ঢুঁড়ে ওষুধটা মিলে গেল। অভিমন্যু বাড়ি ফিরল প্রায় দুটোয়। দরজা খুলেছেন অহীন্দ্র, পরনে তাঁর ধুতি পাঞ্জাবি।

বাবার হাতে ওষুধ দিয়ে অভিমন্যু জিজ্ঞাসা করল, —বেরোচ্ছ? না ফিরলে?

উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে অহীন্দ্র বললেন —এই মাত্র গোবিন্দ এসেছিল তোর খোঁজে। কে একজন এসেছে কারখানায়, তোর জন্য অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছে।

কে এল রে বাবা? অর্ডার দিতে এসেছে, নাকি সরকারি উৎপাত? আজই ভাস্করদা অলুক্ষুণেদের নাম করছিল! শয়তানের নাম করতেই শয়তানের উদয়! কে আসতে পারে? গত সপ্তাহের সেই খেঁকুরেটা, যে কত এমপ্লয়ি আছে খোঁজ করছিল? খাতাপত্র দেখল ঘেঁটে ঘেঁটে, গোবিন্দ মালতীকে বিস্তর জেরা করল, শেষ পর্যন্ত টাকা চাওয়ার কোনও উপলক্ষ না পেয়ে চা মিষ্টি আনাতে বলল! ওই ব্যাটাই যদি হয়, থাকুক বসে।

ধীরে সুস্থে স্নান টান করল অভিমন্যু। তারিয়ে তারিয়ে খেল। মৃদু বচসাও হল বাবার সঙ্গে। পেনশান অফিস থেকে ফেরার সময়ে পথে ননীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল অহীন্দ্রর, এখনও অহীন্দ্র পেনশান পাচ্ছেন না শুনে ননী নাকি খুব আহা উহু করেছে। বলেছে, শিক্ষক সেলের কোন নেতার সঙ্গে নাকি অহীন্দ্রর দেখা করিয়ে দেবে, যাতে কাজটা ত্বরান্বিত হয়। অহীন্দ্রর যে ননীর ওপর বিশেষ আস্থা আছে, তা নয়। তবু একটু দোটানায় পড়ে গেছেন তিনি। নয় নয় করে প্রায় আড়াই বছর হতে চলল, এখনও পেনশান-ভগবানের দেখা নেই, ফলত তিনি খুব উতলা এখন, মনোগত বাসনা একবার নেতার সঙ্গে দেখা করে এলে ক্ষতি কী! অভিমন্যু পই পই করে বাবাকে বারণ করল। ননীদার এই অযাচিত উপচীকির্ষা তার পছন্দ নয়।

খেয়ে উঠে পাঞ্জাবি চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল অভিমন্যু। মৌজ করে সিগারেট টানতে টানতে চলেছে কারখানায়। রণেনবাবুকে রাস্তায় দেখতে পেল। লুঙ্গি আর হাফ পাঞ্জাবি পরে ছাতা মাথায় নাতিকে নিয়ে ফিরছে নার্সারি থেকে। অভিমন্যু একবার ভাবল ডেকে জিজ্ঞেস করে কিছু। থাক, ভদ্রলোক হয়তো সামনের বাড়ির দেবেনবাবুকে দেখিয়ে দেবে। কিংবা হয়তো অমূল্যবাবুকেই। মানুষ চেনা বড় দায়।

কারখানার দরজায় পৌঁছেই অভিমন্যুর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। সেই বিচিত্র সুরভি! তারই চেয়ারে বসে আছে তন্নিষ্ঠা!

অঘটন আজও ঘটে!

নয়

চেয়ার ছেড়ে উঠে দু দিকে দু হাত ছড়িয়ে দিল তন্নিষ্ঠা। মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, —ওয়েলকাম টু মনামি কেমিক্যালস্।

অভিমন্যুর চোখে পলক পড়ছে না, রীতিমতো বিমূঢ় দশা। কাঁধের ইয়া কিটস্ব্যাগ একবার টেবিলে রেখে তুলে নিল, জায়গা পাচ্ছে না নামাবার। সামনের চেয়ার এ পাশে টানল একবার, ও পাশে সরাল...

তন্নিষ্ঠার বেশ মজা লাগছিল। স্মার্টলি ডাকল, —গোবিন্দ, ঝোলাটা এ ঘর থেকে নিয়ে যাও তো। আর তোমার মালিকের কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নাও। বহুক্ষণ বসে আছি, একটু চা ফা আসুক।

অভিমন্যু তাড়াতাড়ি পার্স বার করেছে। একটা একশো টাকার নোট গোবিন্দকে দিয়ে বলল, —যা, ঝট করে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে আয় তো।

তন্নিষ্ঠা নকল কড়া-গলায় বলল, —আমি ঠাণ্ডা খাই না। গোবিন্দ তুমি চা'ই আনো।

—একশো টাকার নোটে চা? বলেই অভিমন্যু সংশোধন করে নিয়েছে, —আর কী খাবে বলো?

—কিচ্ছু না। স্রেফ চা।

গোবিন্দ চলে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে সমে ফিরছে অভিমন্যু। চেয়ারে বসে বলল, —তুমি বাজে কথা বললে কেন? আমি সেদিন নিজের চোখে বিয়েবাড়িতে তোমায় বোতল টানতে দেখেছি!

—আজও টানতাম। তন্নিষ্ঠা হেসে ফেলল, —যদি না এখানে এসে তোমার বিজনেসের হাল দেখতাম!

—মানে?

—মানে, আমি একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলে গোবিন্দ বেচারার হয়তো একদিনের মাইনে চলে যেত!

—আজ্ঞে না। আমার গোবিন্দ মালতী মোটেই হ্যাক থু করার মতো টাকা পায় না। পার ডে ষাট। খুব খারাপ? অভিমন্যু ফস করে একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, —তা হঠাৎ দেবীর দর্শন দেওয়ার কারণটা জানতে পারি কি?

—থ্যাঙ্কস্ জানাতে। থ্যাঙ্কস ফর দা ফোন কল। তন্নিষ্ঠা চোখ নরম করল, —কদিন ধরেই আসব আসব ভাবছি, বাব্বাঃ যা রোদ...! আজ ন্যাশনাল লাইব্রেরি গিয়েছিলাম, বই ফেরত দিতে। হঠাৎ বেহালার মিনি দেখে ভাবলাম যাই, এক ঢিলে দু পাখি মেরে আসি।

অভিমন্যু চোখ সরু করল, —একটা পাখি তো বুঝলাম, অন্য পাখিটা কে? সুপ্রিয় মালবিকা?

—উহুঁ, তোমার ফ্যাক্টরি। অত করে সেদিন ইনভাইট করলে...

—খুঁজে পেতে প্রবলেম হয়নি?

—একটুও না। তোমার অ্যারোমা সত্যিই গোটা লোকালিটিতে ছড়িয়ে আছে। নাম বলতেই রিকশাওলা পৌঁছে দিল। তোমায় না দেখে ভাবছিলাম ফিরেই যাই, তারপর মনে হল বাইরে এত চড়চড়ে রোদ্দুর...। বসে আরাম করে রেস্ট নিচ্ছিলাম।

—বেশ করেছ। অভিমন্যু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল, —আর একটু বোসো, আমি মালগুলো ঠিক ঠিক জায়গায় রেখে আসি। হাতের কাজ পড়ে থাকলে আমার কেমন আনকমফর্টেবল্ লাগে।

বসে থেকে কী করবে তন্নিষ্ঠা? অভিমন্যুর পিছু পিছু সেও এসেছে পাশের ঘরে। গোবিন্দ চা এনে ফেলেছে, হাতে ধরিয়ে দিয়েছে গরম গ্লাস, চুমুক দিচ্ছে সইয়ে সইয়ে। অভিমন্যুর ব্যাগ থেকে একের পর এক জিনিস বেরোচ্ছে, চলছে কাচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখা। কত রকম যে শিশি বোতল বয়াম জার, বাপস্! ঝাঁঝ কী! মিষ্টি গন্ধ উগ্র হলে বড় গা গুলিয়ে ওঠে। কোণের টেবিলে খান তিনেক কাচনল। ওগুলোকেই ব্যুরেট পিপেট বলে না? অভিমন্যু কুমার নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালায় দেখি!

গোবিন্দ আবার মালতীর সঙ্গে হাত লাগিয়েছে। মেঝেয় অ্যাটোমাইজারের পাহাড়, চলছে ঝাড়াই বাছাই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মালতীর চোখ ঘুরছে তন্নিষ্ঠায়, হাসির রেখা উঁকি দিয়েও দিচ্ছে না মালতীর ঠোঁটে।

তন্নিষ্ঠার মজা লাগছিল। মহিলা তাকে অভিমন্যুর ফিঁয়াসে টিয়াসে ভাবে নাকি?

অভিমন্যুর মুখ চোখে এখন বেশ মালিক মালিক ভাব। গম্ভীর গলায় মালতীকে জিজ্ঞেস করল, — তুমি আজ কটায় ডিউটিতে এলে?

—সাড়ে এগারোটা।

—এখন কেমন আছে তোমার ছেলে?

—জ্বরটা এখনও আছে দাদা।

মালতীর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। তাকে দেখে বয়স আন্দাজ করার উপায় নেই। শ্রীহীন ক্ষয়াটে চেহারা। পঁচিশও হতে পারে, চল্লিশও।

আলগা কৌতূহল হচ্ছিল তন্নিষ্ঠার। চাপা স্বরে অভিমন্যুকে প্রশ্ন করল, — কত বড় ওর ছেলে?

মালতী শুনতে পেয়ে গেছে। সেই উত্তর দিল, —পৌষে চার পুরবে গো দিদি।

—আহারে। বাড়িতে কার কাছে রেখে এলে?

—মেয়ে। মেয়েই দেখছে।

অভিমন্যু পাশ থেকে বলল, —ওর মেয়ের বয়স আট।

—সে কী! ওইটুকু মেয়ে সামলাতে পারবে?

—পারতেই হবে দিদি। এ ছাড়া উপায় কী?

অভিমন্যু ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, —তোমার বর বাবাজীবন গেলেন কোথায়?

তিনি তো একটু বাড়িতে বসে ছেলেটাকে দেখতে পারেন।

—হুঁহ্, তাহলেই হয়েছে। এমনিই তার কত মেজাজ! বউ-এর অন্ন খেতে হচ্ছে বলে মানে মটমট করছে!

—ওমা, কেন? তোমার বর বুঝি কিছু করে না? তন্নিষ্ঠা প্রশ্ন করে ফেলল।

—কারখানায় লক আউট। প্রায় চোদ্দো মাস।

—ও। তন্নিষ্ঠা চুপ করে গেল।

অভিমন্যু পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, —কী, আমার কারখানায় এসেছ, কাজকর্ম দেখবে না?

ঈষৎ অন্যমনস্ক তন্নিষ্ঠা মুখে হাসি ফেরাল, —দিখাও।

গোবিন্দ যেন তৈরিই ছিল। বলার সঙ্গে সঙ্গে হাতলওলা কাচের পাত্র থেকে অতি সন্তর্পণে সুগন্ধি তরল ঢালছে চ্যাপ্টা ঘষা কাচের শিশিতে। মালতীর হাত থেকে একটা অ্যাটোমাইজার নিয়ে বোতলের মুখে বসাল, সিলিং মেশিনের নীচে রেখে চাপ দিচ্ছে। শূন্যে সামান্য একটু স্প্রে করল সুগন্ধি, সৌরভ বিছিয়ে গেল ঘরে। সুদৃশ্য ক্যাপ লাগাল শিশিতে, ঢেউ খেলানো পিজবোর্ডে মুড়ল, ঢুকিয়ে দিল বাক্সে।

অভিমন্যু ম্যাজিশিয়ানের মতো হাত দোলালো, —অ্যান্ড দিস ইজ অল্। আমি শুধু পারফিউমটা বানাই।

—ও মা, ওটাই তো আসল।

—হ্যাঁ। তবে ওটা এক্ষুনি তোমায় দেখানো যাবে না। ওটা একটা লং টার্ম প্রসেস।...দেখলেও অবশ্য বুঝবে না কিছু।

—কেন?

—ওটা অরগ্যানিক কেমিস্ট্রি। তোমার সাবজেক্ট তো শব্দের রসায়ন।

—অ্যাই, বেশি এয়ার নিও না। তোমরা কি শেক্সপিয়ার শেলি কিট্স এলিয়ট বোঝো না?

—তা বটে। চলো তবে ও ঘরে, দেখি তোমার মগজে ঢোকানো যায় কি না।

সত্যি সত্যি অফিসঘরে এসে ড্রয়ার থেকে কাগজ বার করে ফেলল অভিমন্যু। খসখস ডায়াগ্রাম টানছে, পর পর ষড়ভুজ এঁকে চলেছে, —এই ধরো, পারকিন রিঅ্যাকশান। এই এখানে একটা সি এইচ ও, আর এখানে একটা ও এইচ... এর সঙ্গে আসছে সোডিয়াম অ্যাসিটেট আর স্যালিসিল অ্যালডিহাইড...

আচ্ছা খ্যাপা তো! এ যে রীতিমতো ক্লাস শুরু করে দিল!

তন্নিষ্ঠা ছদ্ম আতঙ্ক ফোটাল চোখে। হাত জোড় করে বলল, —ক্ষ্যামা দাও। তুমি কি এক্ষুনি আমায় কেমিস্ট করে তুলবে নাকি?

—উৎসাহ নিবে গেল তো? অভিমন্যু হেসে পেন বন্ধ করল, —আমরা কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা শেক্সপিয়ার পড়তে পারি।

দরজায় মালতী, —দাদা, আজ তো বেশি কাজ নেই, আমি কি একটু তাড়াতাড়ি চলে যাব?

এক সেকেন্ড কী যেন ভাবল অভিমন্যু। তারপর বলল, —যাও।...তোমার ডাক্তার কী বলছে? ম্যালেরিয়া নয় তো?

—তেমন তো কিছু বলেনি। শুধু বলেছে আজও জ্বর না ছাড়লে রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে।...একা একা যে কদ্দিক সামলাই! বাজারহাট রান্নাবান্না...। কাল রাত্তিরে জগোর জ্বরটা খুব বেড়েছিল। মাথা ধোওয়াতে হয়েছে, জলপট্টি দিতে হয়েছে...

ঘরের আবহাওয়া সামান্য ভারী হয়ে গেছে। মালতী চলে যাওয়ার পর তন্নিষ্ঠা জিজ্ঞেস করল, —মহিলার খুব প্রবলেমেটিক লাইফ, তাই না?

—হুঁউ। খাটাখাটুনি তো আছেই, তার ওপর বেকার বরের মেল ইগো সামাল দিতে হচ্ছে...

মুহূর্তের জন্য শুভেন্দুর মুখটা তন্নিষ্ঠার সামনে উঁকি দিয়ে গেল। একই স্তরের মানুষ নয় তার বাবা, তবুও। পরশু রাত্রে বাবা দুম করে বলে বসল, তোর বিয়েতে আমি ক্যাশ দু লাখ ডাউন করব তিন্নি, তোর মাকে একটা কথা বলারও সুযোগ দেব না! আসন্ন কর্মহীনতা কি বাবার পুরুষ অহংকে আহত করছে?

একটু চুপ থেকে তন্নিষ্ঠা বলল, —একটা কাজ করো না। ওর বরটাকেও তোমার এখানে লাগিয়ে দাও।

—ধ্যাৎ, তা কী করে হয়! পার ডে মেরেকেটে এখানে সাত আট ডজন মাল সিলিং প্যাকিং হয়, তিনজন তো এখন এখানে সুপার সারপ্লাস।

—তোমার প্রোডাকশান বাড়াও।

—দরকারটা কী! এই তো বেশ চলে যাচ্ছে।

—স্ট্রেঞ্জ! তুমি ব্যবসা বাড়াবে না?

—বিজনেস নিজের গরজে যেটুকু বাড়ার নিশ্চয়ই বাড়বে। এই তো নর্থ বেঙ্গলে মার্কেট ধরার চেষ্টা করছি, বাঁকুড়া বীরভূম পুরুলিয়ার কথাও ভাবছি...। কিন্তু তা বলে... । অভিমন্যু একটু থামল,—দ্যাখো তন্নিষ্ঠা, বিজনেস মানে যদি হয় অন্ধের মতো ছুটে বেড়ানো, তা হলে তাতে আমার আগ্রহ নেই। তোমাকে তো বলেইছি, পারফিউম তৈরি শুধু আমার জীবিকা নয়, এতে আমার এক ধরনের সুখও আছে। ব্যবসা বাড়ানোর নেশায় সেই সুখ আমি খোয়াতে রাজি নই।

কথাগুলো ঠিক বোধগম্য হল না তন্নিষ্ঠার। অবাক মুখে বলল, —এ তো উদ্যমহীনের মতো কথা! তুমি লাইনটা জানো, ভাল পারফিউম তৈরি করতে পারো...জিল থাকলে কোথায় না রাইজ করতে পারো তুমি? কে বলতে পারে তোমার এই মনামি কেমিক্যালস্ই একদিন মিলার ইন্ডিয়া হয়ে যাবে না?

—হল। তারপর?

—তার পর আবার কী! আরও বড় হবে? আরও বড় হবে...

—তারপর? হোয়্যার ডাজ ইট এন্ড? একটা লক্ষ্যে পৌঁছলে আপনাআপনিই সামনে আর একটা লক্ষ্য এসে যায়...এই ছোটার কোনও শেষ আছে?

—ছোটাটাই তো জীবন অভিমন্যু।

—না। আগে আমায় স্থির করতে হবে টাকা রোজগারের জন্যই আমার বেঁচে থাকা, নাকি বেঁচে থাকার জন্য টাকা রোজগার? আমার মিলিয়নিয়ার বিলিয়নিয়ার হওয়ার বাসনা নেই। বেসিক নিডগুলো পুরে গেলেই আমি খুশি। অন্ন বস্ত্র বাসস্থান। অন্ন বস্ত্র মোটামুটি জুটে যাচ্ছে... হ্যাঁ, বাসস্থান নিয়ে একটু সমস্যা আছে, তাও ধীরে ধীরে টাকা জমিয়ে...। হোয়াট মোর ডাজ এ হিউম্যান বিয়িং নিড?

অভিমন্যুর কথা যত শুনছে, স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে তন্নিষ্ঠা। শ্লেষের সুরে বলল, —বুঝেছি, তোমার দ্বারা কিস্যু হবে না। তুমি একটি আদ্যন্ত অ্যাম্বিশানবিহীন মানুষ।

—অ্যাম্বিশান শব্দটার মানে তুমি জানো? তার পরিণাম জানো? এতক্ষণ শান্ত হয়ে থাকা অভিমন্যুর চোখ যেন সহসা ঝলসে উঠেছে। চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। পায়চারি করছে। হঠাৎই তন্নিষ্ঠার একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল, —তুমি নিশ্চয়ই সুপ্রিয় মালবিকার কাছে আমার দাদার কথা শুনেছ?

—না তো। কী হয়েছে তোমার দাদার?

—আমার দাদা হচ্ছে অ্যাম্বিশানের জ্যান্ত ধ্বংসস্তূপ। তাকে দেখলেই তুমি বুঝতে পারতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষকে কোন খাদে ঠেলে দিতে পারে। অভিমন্যু ফিরে চেয়ারে বসল। ডটপেনটা ঠুকছে টেবিলে, তন্নিষ্ঠার চোখে চোখ রেখে বলল, —আমার দাদা খুব ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিল। উপমন্যু মজুমদার কোনওদিন ক্লাসে সেকেন্ড হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় ঢুকেছিল অ্যাম্বিশানের পোকা। দোষটা শুধু তার নয়, তার মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তুই অনেক বড় হবি, অনেক অনেক উঁচুতে উঠবি...। আমার মা বলত, বাবা বলত, প্রতিবেশীরা বলত, আত্মীয়স্বজনরা বলত। আট বছরের বড় দাদা আমার চোখেও বিরাট একটা কিছু ছিল সেসময়ে। মাধ্যমিকে সাংঘাতিক একটা ভাল রেজাল্ট করতে পারল না দাদা, টেনেটুনে স্টার পেয়েছিল। সবাই বলল, এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট, তুই হায়ার সেকেন্ডারিতে ফাটিয়ে দিবি। প্রত্যাশার চাপে আরও খারাপ করল হায়ার সেকেন্ডারিতে, ফার্স্ট ডিভিশানটাও পেল না। পর পর দু বার জয়েন্টে বসল। প্রথম বারে চান্স পেল না, দ্বিতীয় বারেও না। তখন থেকেই দাদার মাথাটা কেমন যেন হয়ে গেল! ম্যাথমেটিক্স অনার্স নিয়ে বি এসসি ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু তখন আর পড়াশুনো করতে পারে না দাদা, বইখাতা খুলে দিনরাত্রি শুধু ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে। আমার দরিদ্র হতভাগ্য স্কুলমাস্টার বাবা তখন আশাভঙ্গের বেদনায় ছটফট করছে। পার্ট ওয়ান পরীক্ষার আগে দাদাকে কী যেন একটা বলেছিল বাবা, ব্যস্ সঙ্গে সঙ্গে দাদা কী ক্ষিপ্ত! দেওয়ালে মাথা ঠুকছে! দরজায় লাথি মারছে! বইখাতা ছিঁড়ছে! চেয়ার টেবিল আছড়াচ্ছে!...তার পরেই সম্পূর্ণ পাথর হয়ে গেল। একেবারে নীরব। ডাকলে সাড়া দেয় না, কথা বলে না, সারাদিন ঘর বন্ধ করে বসে আছে, মানুষ দেখলেই কেমন কুঁকড়ে এক কোণে

চলে যায়, যেন কোনও হিংস্র জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে চাইছে...! সে যে কী টেরিবল্ ফিয়ার সাইকোসিস, তুমি নিজের চোখে না দেখলে বুঝতে পারবে না তন্নিষ্ঠা। অভিমন্যুর গলা ধরে এল, —দাদা আর সুস্থ হয়নি। এখন আছে মানকুণ্ডুর অ্যাসাইলামে। দেখা করতে গেলেও বেরোয় না, অ্যাসাইলামের লোকজনও তাকে টেনে আনতে পারে না। দিন রাত্রি এক অন্ধকার কুঠুরিতে...। লোকে যে যাই বলুক, আমি তো জানি কেন পাগল হয়েছে আমার দাদা। দাদা আমায় বলত, বুঝলি অভি, আমি এত উঁচুতে উঠে যাব, মানুষ আমায় দূরবিন দিয়ে দেখবে! প্রাসাদের মতো বাড়ি বানাব, বিদেশি গাড়ি চড়ব, খোলামকুচির মতো টাকা ওড়াব...! এর পরও তুমি আমায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে বলো?

তন্নিষ্ঠা চুপ। হঠাৎই প্রবল এক চাপ অনুভব করছিল ফুসফুসে। যেন কেউ নিংড়ে নিচ্ছে বাতাস। তীব্র একটা কষ্ট অনুভব করছিল তন্নিষ্ঠা। শুধু সেই অচেনা মানুষটার জন্য নয়, সামনে বসে থাকা অভিমন্যুর জন্যও।

ফ্যাসফেসে গলায় বলল, —কিন্তু তোমার দাদা তো ফেলিওর...!

—যারা সাকসেসফুল, তারা কি আমার দাদার চেয়ে খুব আলাদা? তারাও তো নিজেদের অন্ধ বৃত্তে ঘুরে মরছে। লিভিং ইন আ সলিটারি সেল অফ দেয়ার ওউন। তফাত একটাই, তাদের অ্যাসাইলাম এই গোটা পৃথিবীটা।

সহসা কোনও শব্দ এল না তন্নিষ্ঠার গলায়। মুহূর্তের জন্য কি শেখরকে দেখতে পেল? শৌনককে? অভিমন্যুর কথায় যেন এক গভীর সত্য নিহিত আছে, মনে হচ্ছিল তন্নিষ্ঠার। তবু আজন্মলালিত ধ্যানধারণাগুলো ভেঙে ফেলতেও কেমন যেন খারাপ লাগে।

কথাটা বেরিয়েও গেল মুখ থেকে, —কিন্তু অ্যাম্বিশান না থাকলে কী নিয়ে বাঁচবে মানুষ? কীসের জন্য বাঁচবে?

—স্বপ্ন নিয়ে বাঁচবে।

—স্বপ্ন?

—হ্যাঁ স্বপ্ন। স্বপ্ন আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এক নয় তন্নিষ্ঠা। আমার কোম্পানিতে একটা সেলসম্যান আছে, খুবই সাধারণ ছেলে, পরিবারটাও নিম্নবিত্ত। বাপ নেই, মা অসুস্থ, ভাইবোনের লেখাপড়া, এসব নিয়ে ছেলেটা জেরবার। অসুরের মতো খাটে, ছোটখাটো চুরিচামারি করে, তাতেও ভাল করে দিন গুজরান হয় না। তবু তার মধ্যে ছেলেটার চোখে একটা স্বপ্ন লেগে আছে। ও একদিন মাউন্টেনিয়ার হবে, এভারেস্টের চূড়ায় পা রাখবে। শুধু এই স্বপ্নটা আছে বলেই না...!

অভিমন্যুর দুচোখে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। স্বপ্ন আমারও আছে তন্নিষ্ঠা। তীব্র খরার পর জঙ্গলে প্রথম বৃষ্টি নামলে বুনো লতায় যে গন্ধ ওঠে, আমি আমার পারফিউমে সেই সুগন্ধ আনব।...আমি এমন একটা সুঘ্রাণ সৃষ্টি করতে চাই, যা আমার আগে আর কেউ কখনও পারেনি। সে গন্ধকে আমি পণ্য করব না, সে শুধু আমার...। এটাই কি আমার বেঁচে থাকার যথেষ্ট কারণ নয়?

তন্নিষ্ঠা নির্বাক। নিস্পন্দ। মোহাবিষ্টের মতো তাকিয়ে আছে অভিমন্যুর দিকে।

যে তরুণ মালবিকার বিয়ের রাতে অন্ধকার রাস্তাটাকে বহমান কালো নদী বলেছিল, তাকে যেন একটু একটু চিনতে পারছে এখন। নাকি আরও অচেনা হয়ে যাচ্ছে অভিমন্যু?

দুপুরটা কখন যেন বিকেল হয়ে গেছে। কোত্থেকে এক কুচি মায়া-হলুদ আলো এসে পড়েছে ছোট্ট অফিসঘরে, কাঁপছে তিরতির। টেবিলফ্যানের হাওয়া এখন চামর দোলায়, দেওয়ালে আছাড়ি পিছাড়ি খাওয়া ক্যালেন্ডারে ঘণ্টাধ্বনি বাজে, বাতাসের চাপা সুগন্ধে ধুপধুনোর অনুষঙ্গ—নিদাঘবেলায় অভিষেক হচ্ছে বসন্তের।

মুহূর্তটাকে অবশ্য বেশি দীর্ঘ হতে দিল না অভিমন্যু। তন্নিষ্ঠার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে ফিকফিক হাসছে, —আমার বকবকানিতে মাথা ধরে গেল তো?

তন্নিষ্ঠা জোরে মাথা ঝাঁকাল। ঘোর ঘোর ভাবটা কাটানোর চেষ্টা করছে।

অভিমন্যু ফের বলল, —প্রচুর ভাট বকলাম, এবার তোমার খবর বলো? শৌনক কেমন আছে?

মনে মনে তন্নিষ্ঠা বলল, শৌনক শৌনকের মতোই আছে।

মুখে বলল, —দিল্লি গেছিল ইন্টারভিউ দিতে। পরশু ফিরেছে।

—ইজ ইট? কোন কোম্পানিতে?

মিলার ইন্ডিয়া নামটা উচ্চারণ করতে পারল না তন্নিষ্ঠা। কেন যে পারল না? বলল, —কী যেন একটা নাম। খুব বড় পোস্ট।

—বাহ্ বাহ্। কেমন হল ইন্টারভিউ?

—বলল তো ভালই হয়েছে। ওরা দিন পনেরোর মধ্যে জানাবে। ও এক্সপেক্ট করছে হয়ে যাবে।

—গ্র্যান্ড। তাহলে তুমি পাকাপাকি দিল্লিওয়ালি হয়ে যাচ্ছ?

—জানি না। তন্নিষ্ঠা সামান্য উদাস, —হয়তো দিল্লি থেকে মুম্বই, মুম্বই থেকে দুবাই, দুবাই থেকে আরও দূরে কোথাও, হয়তো অন্য কোনও মহাদেশে...

আবার ক্ষণিকের নৈঃশব্দ্য। আবার হাওয়া চামর দোলাচ্ছে, আবার ঘণ্টাধ্বনি, আবার বাতাসে সুরভি...

ক্ষণপরেই অভিমন্যু প্রগল্‌ভ হয়েছে, —ও হো, তোমাকে তো একটা জিনিস দেখানো হয়নি। তোমার সেই পারফিউমটা আমি তৈরি করার চেষ্টা করছি। এসো এসো, দেখে যাও।

পাশের ঘরে গিয়ে মেঝে থেকে একটা ছোট কাচের জার তুলল অভিমন্যু। ঢাকনা খুলে তন্নিষ্ঠার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

লম্বা ঘ্রাণ নিল তন্নিষ্ঠা। উচ্ছ্বসিত ভাবে বলল, —এই তো আমার ডেড্‌লির স্মেল।

অভিমন্যুর দাড়ি গোঁফের জঙ্গল দুলে উঠল, —উঁহু, হয়নি। আমি জানি।

—কে বলল হয়নি? অবিকল সেম স্মেল!

—মোটেই না। কী যেন একটা মিসিং আছে।

—কী মিসিং আছে?

—জানি না। অভিমন্যু মাথা নামিয়ে নিল। মৃদু গলায় বলল, —এখনও খুঁজছি।

দশ

জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি এবার বৃষ্টি এসে গেল কলকাতায়। সকাল নেই, দুপুর নেই, সময় নেই, অসময় নেই, যখন তখন মেঘেরা দখল করে নিচ্ছে আকাশ। পথে-ঘাটে ট্রামে-বাসে সর্বত্র শুরু হয়ে গেছে আলোচনা, বর্ষার এই অকাল আগমনের হেতু কী! কেউ বলে এল্-নিনো, কেউ বলে পরিবেশ দূষণ। কেউ বা বলে এরকম নাকি প্রতি পাঁচ দশ বছর পর পরই হয়, এমনটাই তারা দেখে আসছে ছোটবেলা থেকে! দু চারজন অবশ্য মেঘবাহিনীর আক্রমণের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও খুঁজে পেয়েছে, বাদলা দিনে মিটিং মিছিল প্রতিবাদ সভার ঘোর অসুবিধে!

সে যাই হোক, মৌসুমি বায়ুর ঝাপটায় কলকাতার নাগরিক জীবন বেশ বিপর্যস্ত। ঘরে ঘরে এখন জ্বর সর্দি কাশি।

নন্দিতার সংসারেও ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ। তন্নিষ্ঠা কদিন জ্বরে ভুগে উঠল, শুভেন্দু ঘং ঘং কাশছে, নন্দিতারও মাথা টিপটিপ, নাক সুড়সুড়। এর মধ্যেই রন্টুর ফোন, চিন্ময়ীও কাত।

আজ অফিস ছুটির পর মাকে দেখতে বাপের বাড়ি ছুটল নন্দিতা। গিয়ে দেখল মাতৃদেবী টলোমলো বটে, তবে এখনও পুরোপুরি শয্যাশায়ী নন। টুকুসের আগেই ফ্লু হয়েছিল, সেই নাকি অসুখটা চালান করেছে ঠাকুমাকে, এই বলে বিস্তর অভিযোগ জানালেন চিন্ময়ী। টুকুসকে নাকি সাত বার ডেকেও তাঁর ঘরে ঢোকাতে পারেন না, অথচ জ্বর হওয়ার পর টুকুস নাকি সারাক্ষণ ঠাকুমার খাটে শুয়ে থাকত, হঠাৎ তার ঠাকুমার আদর খাওয়ার শখ উথলে উঠল, ইত্যাদি ইত্যাদি। রন্টু আজ তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরেছে, মাকে নিয়ে ভাই বোনে হাসাহাসি করল এক চোট, খাওয়া-দাওয়া হল, গল্প গুজব হল...

উঠতে উঠতে নন্দিতার আটটা বেজে গেল। সেলিমপুর বাসস্ট্যান্ডে এসে, আকাশের দিকে আড়ে তাকাতে তাকাতে একটা ট্যাক্সির জন্য আঁকুপাকু করছে, তখনই নির্মলের সঙ্গে দেখা।

নির্মলই পিছন থেকে ডাকছে, —কি গো মেমসাহেব, দেখতেই পাচ্ছ না যে?

নির্মলকে তেমন একটা পছন্দ করে না নন্দিতা। প্রথমত, এই লোকটা শুভেন্দুর পাগলামির স্যাঙাৎ, দ্বিতীয়ত তার পারিবারিক জীবনের কোনও গূঢ় তথ্যই নির্মলের অজানা নেই।

তবু অনেককাল পর নির্মলকে দেখে একটু বুঝি খুশিই হল নন্দিতা। হেসে বলল, —সত্যিই দেখতে পাইনি।...আপনি আমার বাপের বাড়ির পাড়ায় কেন?

ইয়া বড় কাঁধঝোলা ব্যাগটাকে দেখাল নির্মল, —এই যে, দিনগত পাপক্ষয়! হেড এগ্‌জামিনারের কাছে এসেছিলাম। খাতা নিতে।

—ও।...তারপর বাড়ির খবর কী? মঞ্জরী...?

—কেউই ভাল নেই, কেউই খারাপ নেই, সবাই আছে একরকম। বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারার নির্মল স্বচ্ছ হাসল। রসিক ভঙ্গিতে বলল, —তোমরা তো মেরে দিলে!

—কী মারলাম?

—তিন্নির জন্য জব্বর পাত্র ঠিক করে ফেলেছ!

—আমি করেছি। নন্দিতা তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

—হ্যাঁ, তুমিই করেছ। সাহেবও তাই বলেছে। নির্মল মৃদু হাসল, বিয়ের বাজার-টাজার কি শুরু হয়ে গেছে?

—চলছে। এবারও নির্মলকে একটু ঠেস দেওয়ার লোভ সামলাতে পারল না নন্দিতা, —একা একা যতটা যা করতে পারি। আপনার বন্ধুকে তো কিছু বলার উপায় নেই, তিনি এখন ভলান্টারি রিটায়ারমেন্টের শোকে রয়েছেন...

—হ্যাঁ, সাহেব খুব আপসেট হয়ে পড়েছে। তার ওপর গ্রুপটাও ভেঙে গেল...

—সমিধ ভেঙে গেছে? নন্দিতা ভীষণ চমকেছে।

—নাহ্, সমিধ ভাঙেনি। নির্মল স্থির চোখে নন্দিতাকে দেখল, আমি আর সাহেব সমিধ ছেড়েছি।

—হঠাৎ?

—বাসবেন্দ্রর সঙ্গে মতে মিলছিল না। ও দলে এক ধরনের অটোক্রেসি চালাচ্ছে, রীতিফিতি কিছুই মানছে না। কাউকে না কাউকে তো প্রোটেস্ট করতেই হবে, কী বলো? একটু থামল নির্মল। বলল, একটা ভাল নাটকের প্রোপোজাল দিয়েছিলাম, বাসবেন্দ্র স্ট্রেট রিজেক্ট করে দিল! সমিধ এখন কমার্শিয়াল হয়ে গেছে, সস্তায় বাজার কিনতে চায়। সো উই আর আউট।

নন্দিতা অস্ফুটে প্রশ্ন করল, —কবে হয়েছে এসব? কদ্দিন?

—তা ধরো, মাস খানেকের ওপর।...সাহেব তোমায় কিচ্ছু বলেনি?

নন্দিতা ঈষৎ অস্বচ্ছন্দ বোধ করল। আমতা আমতা করে বলল, —না, আমিও ফেরার পরে খুব টায়ার্ড থাকি, ও'ও কী সব লেখালিখি করে, বিশেষ একটা কথাও হয় না...

—উঁউ। নির্মল চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ল, —সাহেব একদম ভেতর থেকে ভেঙে পড়েছে। কত বার করে বললাম, এসো একটা নতুন গ্রুপ তৈরি করি, সাহেবের কোনও চাড়ই নেই। তিন চারটে ছেলেমেয়ে পেয়েওছিলাম, কিন্তু আর তো ওদের ধরে রাখা যাচ্ছে না...। টোটাল ভ্যাকুয়ম নিয়ে কী করে যে থাকবে! ওর মতো একজন স্ট্রং এনারজেটিক মানুষ...!

একটু একটু করে রহস্য পরিষ্কার হচ্ছিল নন্দিতার কাছে। কদিন আগে

মিনিবাসের জানলা থেকে দেখেছে নিরাসক্ত ভঙ্গিতে কার্জন পার্কের ধারে দাঁড়িয়ে আছে শুভেন্দু, মাত্র ছ সাত হাত দূরে থামল বাসটা, নন্দিতা একদম কাছেই, শুভেন্দু দেখতেই পেল না! সেদিন মনে হয়েছিল ইচ্ছে করে দেখেনি, বাড়ি ফিরে লোকটাকে জিজ্ঞেস করতেও নন্দিতার মানে লেগেছিল, আজ বুঝতে পারছে...! শুভেন্দু আজকাল বাড়িতেও যেচে কথা বলে না একদম, এমনকী তিন্নির সঙ্গেও না!

নির্মল বুঝি নন্দিতার ক্ষণিক অন্যমনস্কতা লক্ষ করেছে, আর শুভেন্দুর প্রসঙ্গে গেল না। জিজ্ঞেস করল, —তোমার জামাই নাকি দিল্লিতে ভাল চাকরি পেয়েছে?

নন্দিতা আলগা হাসল, —পায়নি এখনও, পাব পাব স্টেজে আছে। এই তো পরশু আবার দিল্লি গেল, ফাইনাল ইন্টারভিউ দিতে।

—তিন্নির স্লেটের ইন্টারভিউ কবে কিছু জানতে পারল?

—না। বলছিল তো, পুজোর আগে হতে পারে।

—হ্যাঁ, ইংলিশের বোর্ড বোধহয় ওই সময়ই বসবে।...কিন্তু তিন্নি তো দিল্লিই চলে যাবে!

—তা ঠিক। বর গেলে ওকে তো যেতেই হবে।

—হুম্। তোমরাও খুব একা হয়ে যাবে তখন।

নির্মলের কথায় কি অন্য কোনও ইঙ্গিত আছে? নন্দিতা সতর্ক হতে চাইল। তবু আপনা থেকেই অভিমান ফুটে উঠেছে গলায়, —আমি তো চিরকালই একা নির্মলদা।

নির্মল দু এক সেকেন্ড নিশ্চুপ। ঠোঁট টিপে ঘাড় নাড়ছে। হঠাৎ সোজা তাকাল, —মানুষ তো একাই মেমসাহেব। আমরা শুধু একত্রে বাসই করি। স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে ভাই বোন মা বাবা...নানা রকম সম্পর্কের বৃত্ত তৈরি করে একা হয়ে থাকাটাকে সহনীয় করে রাখতে চাই। কিন্তু আলটিমেট্লি কী থাকে বলো? প্রেম ভালবাসা ঝগড়া অশান্তি মনোমালিন্য কিসুই কিস্যু না। লাইফের ফ্যাগ এন্ডে এসে আবার আমরা যে একা সে একাই। এটাই সত্য। এটাই বাস্তব। তবু তার মধ্যেও মানুষ কিছু একটা আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার রসদ খোঁজে। একদম নিজের মতো করে। এটাকে তুমি তার প্যাশান বলতে পারো, নেশা বলতে পারো, শখ বলতে পারো, বদখেয়াল বলতে পারো...। কিন্তু সেটুকুও চলে গেলে মানুষ একেবারে নিরবলম্ব হয়ে যায়। হি সিজেস্ টু বি আ ম্যান। বলতে বলতে হঠাৎ গলা নামিয়েছে নির্মল, —সাহেবের জন্য রিয়েলি আমার ভয় হচ্ছে...

নির্মল চলে যাওয়ার পরে বাসস্ট্যান্ডে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নন্দিতা। নিঝুম। নির্মলও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে জ্ঞান দিয়ে গেল। আশ্চর্য, নন্দিতাকে কেউ কোনওদিনই বুঝল না! নন্দিতাও তো আঁকড়ে ধরার কিছু চেয়েছিল!...ভরা মাস, যে কোনওদিন পৃথিবীতে আসবে তিন্নি, বেমালুম তাকে ফেলে নর্থ বেঙ্গল শো করতে চলে গেল শুভেন্দু! ভাবনা কীসের, তোমার বাড়ির লোক, আমার বাড়ির

লোক, সবাই তো রইল! বিভাবতী মেটারনিটি হোমের বেডে শুয়ে আছে নন্দিতা, পাশে সদ্যোজাত তিন্নি, একের পর এক আত্মীয় পরিজন আসে, একজনই শুধু নেই! বিবাহবার্ষিকী ভুলে গেল, রিহার্সালে মত্ত! মেয়েকে ভর্তি করতে হবে স্কুলে, শুভেন্দু দিব্যি চলে গেল আসানসোল! স্কুলে ইন্টারভিউয়ের সময়ে পেরেন্টস্‌দের দুজনকেই থাকতে হবে, শুনেই কী রাগ! অমন কায়দার স্কুলে মেয়েকে ভর্তি করার দরকার কী! অফিসের পিকনিকে সব মহিলা কলিগের বর যাচ্ছে, শুভেন্দু নেই! শ্যালো লোকজনদের সঙ্গে আমার পোষাবে না, সারাক্ষণ শুধু প্রোমোশানের কথা, ইনক্রিমেন্টের গল্প...! কবে কোন্ দিন কখন নন্দিতার পাশে থেকেছে শুভেন্দু? কোন সাধ পূর্ণ করেছে? প্রতিটা ঠোক্করই তো তিলে তিলে নন্দিতার আবেগকে হত্যা করেছে। কে কবে কখন তাকে বলেছে, আহা নন্দিতা তুমি কী একা!

তবু এই মুহূর্তে শুভেন্দুর জন্য কষ্ট হচ্ছে বইকী। যে নাটক নিয়ে তাদের এত সংঘাত, যে নাটকের বাতিক চরম অসুখী করেছে নন্দিতাকে, সেই নাটকের সঙ্গে শুভেন্দুর সংস্রব ঘুচে যাওয়ার জন্য নন্দিতার তো আজ কণামাত্র হলেও উল্লসিত হওয়া উচিত। কিন্তু তেমনটা হচ্ছে না কেন? নন্দিতার মনের কোন্ গোপন কন্দরে এখনও শুভেন্দুর জন্য ভালবাসার বাষ্প সঞ্চিত আছে?

হা ঈশ্বর, ভালবাসা কি তবে মরে না!

কম্পাউন্ডের গেটে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ধীর পায়ে সিঁড়ি ভাঙছিল নন্দিতা। দোতলার ল্যান্ডিংয়ে তাদের কোঅপারেটিভের সেক্রেটারি দীপক ষড়ঙ্গী।

নন্দিতাকে দেখে দীপকের মুখে পরিমিত হাসি, —ম্যাডাম খুব টায়ার্ড মনে হচ্ছে? স্যাটারডে ইভনিংয়ের কথা স্মরণে আছে তো?

—কী ব্যাপারে বলুন তো?

—কোঅপারেটিভের অ্যানুয়াল মিটিং আছে না! মেন্টেনেন্স নিয়ে একটু প্রবলেম হচ্ছে, তারপর সিকিউরিটি গার্ডটিকেও বদলানোর কথা চলছে...। দেখলেন তো, রায়বাবুর ফ্ল্যাটে দিনদুপুরে কেমন চুরিটা হয়ে গেল!

—হুঁ। আসব।

—মিস্টার দাশগুপ্তকেও ধরে আনবেন।...উনি তো এখন মোটামুটি ফ্রি, ওঁকে কিন্তু এবারে দায়িত্ব নিতে হবে।

—বলব।

পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে নন্দিতার কপালে ভাঁজ। শুভেন্দুর বেকার হয়ে যাওয়ার খবর এর মধ্যেই চাউর হয়ে গেছে? তিন্নি মোটেই বলে বেড়ানোর মেয়ে নয়, অন্তত বাবার ব্যাপারে সে যথেষ্ট স্পর্শকাতর। শুভেন্দুও নিশ্চয়ই ডেকে ডেকে জানায়নি! আশ্চর্য, কোন্ রন্ধ্রপথে যে প্রতিবেশীদের কানে সব সংবাদ পৌঁছে যায়!

দীপকের প্রস্তাবে মনে মনে একটু হাসিও পেল নন্দিতার। চাকরি নাটক ছেড়ে এখন এই ফ্ল্যাটবাড়ির কোঅপারেটিভের পাণ্ডা হবে শুভেন্দু? কল পায়খানা

জলের পাম্পের তত্ত্বাবধান করবে?

ফ্ল্যাটের দরজা খুলেছে তন্নিষ্ঠা। পরনে একটা ঝাপ্পি ঝুপ্পি কাফ্‌তান। মুখের শুকনো শুকনো ভাব এখনও মিলোয়নি।

চটি ছাড়তে ছাড়তে নন্দিতা জিজ্ঞেস করল, —তোর বাবা ফিরেছে?

—ফিরে বেরিয়েছে। কাল এখানে বাজার বন্ধ। কোন্ এক দোকানদার মারা গেছে...। টুকিটাকি কী সব কিনতে গেল।

—ও। সকালে কখন বেরিয়েছিল?

—যখন বেরোয়। আজ অফিস গেছিল তো।

মেয়েকে ঝলক নিরীক্ষণ করে নিল নন্দিতা। সত্যি বলছে কি না তিন্নি বোঝা মুশকিল। বাবার দিকেই টেনে কথা বলে মেয়ে, চিরকাল। অশান্তি এড়ানোর চেষ্টা!

ঘরে এসে জামাকাপড় না বদলেই আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল নন্দিতা। একটু গায়ে জল ঢাললে ভাল লাগত, সাহস হচ্ছে না। মাথাটা কেমন ইট হয়ে আছে, চাপ চাপ ভাবটা ফিরে আসছে। তিন্নিকে ডেকে একটা ট্যাবলেট ফ্যাবলেট দিতে বলবে? থাক গে।

চোখটা জড়িয়ে এসেছিল। হঠাৎই আলোর ঝলকানিতে ঘোর ছিঁড়েছে। শুভেন্দু। তাকে দেখেই আলো নিবিয়ে শুভেন্দু তড়িঘড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিল, নন্দিতাই ডাকল, —শোনো।

শুভেন্দু দরজায় দাঁড়াল, —কী?

—এদিকে এসো। কথা আছে।

আলো জ্বেলে চেয়ারে এসে বসল শুভেন্দু।

নন্দিতা নিচু স্বরে প্রশ্ন করল, —তুমি সমিধ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছ, বলোনি তো?

শুভেন্দু উত্তরও দিল না, পাল্টা প্রশ্নও করল না। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের দেওয়াল দেখছে।

—নির্মলদার সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল।

—আন্দাজ করছি।

—নির্মলদা বলছিল তুমি নাকি আর নতুন গ্রুপ করাতে ইন্টারেস্টেড্ নও?

জবাব নেই।

—কারণটা কী জানতে পারি?

—এটা আমার পারসোনাল ব্যাপার।

—না, পারসোনাল ব্যাপার নয়। স্বাভাবিক থাকতে চেয়েও নন্দিতা গলা সামান্য চড়িয়ে ফেলল, —সারাজীবন আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এখন এ কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না?

—যদ্দূর সম্ভব কম্পেন্সেট করার চেষ্টা করছি। এখন সংসারের কোন্ কাজ আমি করি না?

—থাক, তোমার কাজের অপেক্ষায় আমার সংসার কোনওদিন বসে থাকেওনি, থাকবেও না। নাটক ছেড়ে দিয়ে এখন তুমি ঘরের কাজ দেখাচ্ছ?

শুভেন্দু বিমূঢ় চোখে তাকাল, —তুমি হঠাৎ আমার নাটক ছাড়া নিয়ে পড়লে কেন?

—আলবত পড়ব। হাজার বার বলব। এখন নাটক ছেড়ে তুমি আমার কোন স্বর্গে বাতিটা দেবে, শুনি? নন্দিতা উত্তেজিত মুখে উঠে বসেছে, —ছাড়বেই যদি, তো পঁচিশ বছর আগে ছাড়োনি কেন?

—ভুল হয়েছে।

—ব্যস্, ভুল হয়েছে বললেই সব চুকে গেল? ফিরবে আমার পঁচিশটা বছর?

—তাহলে এখন আমি কী করতে পারি, বলো? রোজ একশো হাত করে নাকখৎ দেব? তিনশো বার করে কান ধরে উঠ্ বোস্ করব? শুভেন্দুও তেতে উঠেছে, —কী করলে তোমার শান্তি হবে বলো, তাই করব।

—আমার শান্তি তোমায় কে দেখতে বলেছে? ন্যাকা সেজো না, তুমি খুব ভাল মতোই বোঝো তোমার এখন কী করা উচিত।

তন্নিষ্ঠা ঘরে ঢুকল, —কী ব্যাপার, তোমরা হঠাৎ চিল্লামিল্লি শুরু করলে কেন?

—এই দ্যাখ্ না তোর বাবা...! সারাটা জীবন মাছ ঘেঁটে এখন বিধবা সাজছে!

তন্নিষ্ঠা একবার নন্দিতার দিকে তাকাচ্ছে, একবার শুভেন্দুর দিকে। শুভেন্দু তীব্র এক দৃষ্টি হেনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। একটুক্ষণ ফ্যালফ্যাল দাঁড়িয়ে থেকে তন্নিষ্ঠাও। লিভিং রুমে বাপ মেয়েতে কথা হচ্ছে, অনুচ্চ স্বরে, আওয়াজ পাচ্ছিল নন্দিতা।

ধপ করে নন্দিতা শুয়ে পড়ল আবার। মাথার পিছনটা দপদপ করছে। একটা দুনিয়া তছনছ করে দেওয়া ক্রোধ নেহাই পিটছে ক্রমাগত। তার জীবনের এতগুলো বছর মিথ্যে হয়ে গেল? এত কষ্ট সহ্য করেছে, ফাটাফাটি করেছে, সবই কি শুধু তিন্নির মুখের দিকে তাকিয়ে? আর কোনও কারণ ছিল না? নাটক ছেড়ে দিয়ে তার এতদিনকার সংগ্রামকে শূন্যগর্ভ করে দিচ্ছে লোকটা? তার অহংকে এভাবে চূর্ণ করে দিতে চায়?

নন্দিতার তাহলে আর কী রইল?

তন্নিষ্ঠা খাবার দাবার গরম করে ফেলেছে। ডাকছে খেতে। বাথরুম ঘুরে এসে ডাইনিং টেবিলে বসল নন্দিতা। নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করছে নৈশাহার। বাবা মা মেয়ে তিনজনই যেন যন্ত্রমানব এখন।

খাওয়া দাওয়ার পর অভ্যাস মতো নন্দিতা বোকা বাক্সের সামনে বসল একবার। ফাঁকা চোখ, বোধহীন মুখ। টিভিতে খেলার চ্যানেল। কার রেসিং শেষ হয়ে শুরু হয়েছে বক্সিং। অসহ্য খেলা, একটা লোককে একটানা পিটিয়ে যাচ্ছে আর একজন, গলগলিয়ে রক্ত ছুটছে লোকটার মুখ দিয়ে, লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে। অন্য দিন চ্যানেল ঘুরিয়ে দেয় নন্দিতা, আজ রিমোট পর্যন্তও হাত এগোচ্ছে না।

লোকটার থ্যাঁতলানো মুখ দেখে চিনচিন করছে বুক। আশ্চর্য, বার বার পড়ে গিয়েও ওঠে লোকটা, দশ গোনার আগেই...!

নন্দিতা পায়ে পায়ে ঘরে ফিরল। ড্রয়ার হাতড়ে হাতড়ে মাথা ধরার ট্যাবলেট পেল একটা, ওষুধটা খেয়ে শুয়ে পড়েছে। অ্যানালজেসিকের প্রভাবে স্নায়ু স্তিমিত ক্রমশ।

বাইরে কাশির ঘং ঘং আওয়াজ। আবছা ঘুম ভেঙে গেল নন্দিতার। পাশে শুভেন্দু নেই। এখনও শোয়নি লোকটা?

নন্দিতা খাট থেকে নেমে লিভিং রুমের অন্ধকারে এসে দাঁড়াল। ব্যালকনির রেলিঙে হেলান দিয়ে সিগারেট টেনে চলেছে শুভেন্দু, আর বুকে হাত চেপে কাশির দমক সামলাচ্ছে। কী শীর্ণ দেখাচ্ছে মানুষটাকে! কী ভীষণ কুঁজো কুঁজো লাগে!

বুকের ভেতর একটা কান্না উথলে উঠল নন্দিতার। ঝগড়া বিবাদ করে তবু একটা মানুষের সঙ্গে সহবাস করা যায়, কিন্তু অক্ষম পরাজিত অর্ধমৃত ওই শুভেন্দুর সঙ্গে সে ঘর করবে কী করে!

ফিসফিস করে নন্দিতা ডাকল, —শুনছ...? অ্যাই...? এখনও সময় আছে...

শুভেন্দু শুনতে পেল না।

এগারো

রবিবার সাতসকালে বীথিকার ফোন। স্বামী পুত্র সমভিব্যাহারে ছেলের ভাবী শ্বশুরবাড়িতে আসছে বীথিকা। আজই। দশটা নাগাদ। শুভেন্দু নন্দিতার সঙ্গে কী যেন জরুরি দরকার আছে।

তন্নিষ্ঠাই টেলিফোনটা ধরেছিল। পল্টন-সহ বীথিকার হঠাৎ আগমনের কারণটা অনুমান করার চেষ্টা করছিল সে। কী হতে পারে? ছেলে চাকরিটা পেয়ে গেছে বলে মিষ্টি খাওয়াতে আসছে?, সে জন্য তো বাবা মাকেই ও বাড়িতে নেমন্তন্ন করতে পারে! ছেলে বিশ হাজার থেকে তিরিশ হাজারি হয়ে গেল বলে প্রত্যাশা কিছু বাড়ল কি? খাট যখন দিচ্ছই, সিক্স বাই সেভেন কেন, বারো বাই চোদ্দোই কিনো! ফ্রিজ যদি দাও একশো পঁয়ষট্টি নয়, তিনশো লিটারটা...! কিন্তু না। শৌনকের দাপুটে বাবার দেমাক আছে খুব, যেচে ওরকম কিছু বলতে ছুটে আসবে বলে মনে হয় না। আর কী কারণ থাকতে পারে? অচানক তন্নিষ্ঠাকে বাতিল করল?

অজান্তেই তন্নিষ্ঠার বুক বেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল। উঁহু তার কপালে এমনটা লেখা নেই।

শৌনক দিল্লি থেকে ফিরেছে বুধবার। পরশু সন্ধেবেলাই এ বাড়ি ঘুরে গেছে। হইহই করছিল খুব। কোনও খিঁচ থাকলে শৌনকের মুখে চোখে তা প্রকাশ পেতই। শৌনক নিপুণ অভিনেতা নয়। সর্বোপরি বিয়ে ভাঙতে শৌনককে কেন

সঙ্গে আনবে শৌনকের বাবা মা?

তাহলে?

বিজবিজ ভাবনাটা মাথায় নিয়েই ঘরদোর ঝাড়াঝুড়িতে হাত লাগিয়েছে তন্নিষ্ঠা। নন্দিতার হুকুম। নন্দিতাও মহা ব্যস্ত এখন। মেয়ের কাজকর্মে তার আস্থা কম, মেয়ে ডাস্টার বোলানোর পরও নিজের হাতে ঘষে ঘষে মুছছে সোফা ক্যাবিনেট শোকেস সেন্টার টেবিল। চোখটাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র করে ধূলিকণা খুঁজছে জানলার গ্রিলে, মেঝেয়। শুভেন্দু সকাল থেকে তিন বার দৌড়ল বাজারে। ভেট্‌কি মাছের ফিলে কিনে আনল, বার্গার আনল, পেস্ট্রি আনল, কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতলও। অবশ্য কিছুই খাবেন না ডাক্তার সুকুমার রায়চৌধুরী, তবু প্লেট তো সাজাতে হবে। দুটো বেডরুমেরই চাদর পর্দা পাল্টে ফেলেছে নন্দিতা। বলা যায় না, যদি বীথিকাদি ঘরে ঢোকে। গৃহসজ্জার জন্য এসে গেল ফুল, ইয়া মোটা মোটা রজনীগন্ধা। হাইব্রিড। দেখতে ভারী মনোহর, তবে প্রায় গন্ধহীন।

রায়চৌধুরী পরিবার পৌঁছল কাঁটায় কাঁটায় নটা চুয়ান্নয়। সম্ভবত ওই রকমই যাত্রার যোগ ছিল আজ। সুকুমার ষাট ছুঁই ছুঁই, হাইট খুব বেশি নয়, কষা চেহারা, মাথায় একটা দুটো রুপোলি ছিট থাকলেও বাকি চুল এখনও কুচকুচে কালো। তুলনায় বীথিকা একটু বেশি শুভ্রকেশী, চেহারাটাও তার বেশ লম্বাচওড়া, সাজপোশাকে একটা আভিজাত্য আছে। নিয়মিত পার্লারে যায়। মুখমণ্ডলে তার ছাপ স্পষ্ট। পাকা চুলের অভিনব বিন্যাসেও।

বাবা মার পাশে শৌনক আজ সুবোধ বালক। লাল টুকটুকে টিশার্ট আর জিনসে তাকে ভারী বাচ্চা বাচ্চা দেখাচ্ছে।

শুভেন্দু দেঁতো হেসে আপ্যায়নে বসল। এলোমেলো টপিক নিয়ে গল্প জুড়েছে। আবহাওয়া বর্ষা অ্যান্টিবায়োটিক ম্যালেরিয়া দুর্নীতি রাজনীতি...

নন্দিতা রান্নাঘরে। ফ্রাই ভাজছে। তন্নিষ্ঠা মাকে হাতে হাতে সাহায্য করছিল, তার মধ্যেই সুকুমারের হাঁক শুনতে পেল,—ব্যাপারখানা কী, অ্যাঁ? আপনারা গেলেন কোথায়?

তন্নিষ্ঠা তাড়াতাড়ি মাকে বলল,—তুমি যাও। আমি সব ঠিকঠাক করে নিয়ে আসছি।

—পারবি তো? ফ্রাইয়ের সঙ্গে কিন্তু সস্‌ দিস।

—হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ। আমি কি একেবারেই অলবড্ডি?

খাবারের প্লেট সাজিয়ে কমলার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিল তন্নিষ্ঠা। নিজে এসেছে কোল্ড ড্রিঙ্কসের ট্রে নিয়ে। বসার আগে শৌনককে আর একবার টেরচা চোখে দেখল। তার নিজের পরনেও আজ টুকটুকে লাল পিওর সিল্‌ক্‌।

সুকুমার যথারীতি গাঁইগুঁই শুরু করেছে। অনেক সাধাসাধির পর শুধু ফ্রাইটুকু তুলে নিল। বীথিকার মিষ্টি বারণ, মিষ্টিতেই লোভ, পেস্ট্রিতে কামড় বসিয়েছে সে। শৌনক প্রায় এ বাড়িরই ছেলে, সে পুরো প্লেটটাই টেনে নিল কাছে। ছোট্ট ছোট্ট চুমুক দিচ্ছে কোল্ড ড্রিঙ্কসে।

ফিশফ্রাই চিবোতে চিবোতে সুকুমার কাজের কথা পাড়ল,—বুঝলেন শুভেন্দুবাবু, আমার ছেলেটি তো আমাদের মহা ঝামেলায় ফেলে দিল।

—কেন? কী হল?

—ওই যে, চাকরিটা পেয়ে গেছে! ওই নিয়েই তো ঝঞ্ঝাট। ওকে জয়েন করতে হবে...টেন্টেটিভ্লি যা ঠিক হয়েছে, অগস্টের গোড়ায়...

নন্দিতা বলল, —হ্যাঁ, জানি তো। শৌনক বলেছে।

—ওটা নিয়েই তো...। কাল বাবুই ওর মার কাছে খুব কাঁই কাঁই করছিল। অগস্টে জয়েন করলে নভেম্বরে নাকি আর বিয়ে করতে আসতে পারবে না...। এলেও কোনও মতে তিন দিনের ছুটি নিয়ে উড়ে আসবে, উড়ে ফিরবে, ব্যস্। নামী কোম্পানি তো, ওরা বিয়ে টিয়েকে আমল দেয় না।

—ওটাই যে একমাত্র কারণ, তা নয়। বীথিকা ফিক ফিক হাসছে। ছেলের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল, —কী রে বাবুই, আসল কারণটা বলব?

শৌনক কাঁধ ঝাঁকাল।

বীথিকা নন্দিতার দিকে তাকিয়ে বলল, —বাবুই তোমার মেয়েকে না নিয়ে কলকাতা ছেড়ে নড়তে রাজি নয়।

নন্দিতা এখনও পুরোটা বুঝতে পারেনি। বলল, —তো?

শুভেন্দু হেসে ফেলল, —বিয়েটা আপনারা এগোতে চাইছেন, তাই তো? ...কিন্তু দাদা, আপত্তি তো আপনাদেরই...

—হ্যাঁ অ্যা। সুকুমার মাথা চুলকোল,—কিন্তু ছেলে এমন বায়না জুড়েছে...। ওর কথার অবশ্য যুক্তিও আছে। একা একা ওখানে ও খুব লোন্লিও ফিল করবে। ...তাই আমি প্রায়শ্চিত্তের বিধানটার কথা ভাবছিলাম...

তন্নিষ্ঠা ক্রমশ হাঁ হয়ে যাচ্ছিল। শৌনকের মনে এই বাসনা ছিল, কই পরশুও তো একবারও বলেনি? চাপা একটা অস্বস্তিও হচ্ছিল তন্নিষ্ঠার। কেন অস্বস্তি?

সুকুমার বলে চলেছে, —আমাদের বাড়ির পুরোহিতের সঙ্গে কাল রাতেই টেলিফোনে কথা বলেছি। সে বলল, হয়ে যাবে। যাণ্মাসিক কাজ তো করা হল, সেটাই তো অনেকটা অশৌচ খণ্ডে দিয়েছে। মোর দ্যান ফিফ্‌টি পারসেন্ট। সো উই ক্যান ফিক্স এ ডেট অ্যাট শ্রাবণ। সতেরোই জুলাই, সম্ভবত দোসরা শ্রাবণ পড়ছে, ওই ডেটটা আমার খুব পছন্দ।

নন্দিতা বলল, —মানে আর মাত্র দেড় মাস?

—খুব প্রবলেম হবে?

বীথিকা বলল, —ঘাবড়াচ্ছ কেন নন্দিতা? তোমার তো মোটামুটি আয়োজন সব করাই আছে।

শুভেন্দু বলল, —তা আছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বিয়েবাড়ি পাওয়া...! খাট টাটগুলোও এখনও অর্ডার দেওয়া হয়নি...!

নন্দিতা ঝটপট বলে উঠল, —বাড়ি নিয়ে খুব সমস্যা হবে না। ও বাড়ি যদি নাও পাই, অন্য বাড়ি নেব। তিন্নিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে, খাট আলমারি

ফ্রিজ টিজ এখনই বুক করে দিলে দেড় মাসে কি পাব না?

—অ্যাই নন্দিতা, তুমি ওসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ কেন? আমি তো অন্য কথা ভাবছিলাম।

—কী বীথিকাদি?

—তুমি যদি ফার্নিচার আদৌ না কেনো...মানে এখান থেকে না কেনো...দিল্লিতে আমরা দুই বেয়ানে গিয়ে ওদের সংসার সাজিয়ে দিয়ে আসব। তখন তুমি ওখান থেকে যা প্রাণ চায় কিনো। মিছিমিছি এখান থেকে সব প্যাক করে পাঠাবে, তার ট্রান্সপোর্টেশান খরচা নেই? এটা বরং অনেক ইকনমিক হবে, প্র্যাকটিকালও হবে। দিল্লিতেও খুব সুন্দর সুন্দর ডিজাইন পাবে। বলতে বলতে তাকিয়েছে তন্নিষ্ঠার দিকে, —তুমি কী বলো, আমার আইডিয়াটা খারাপ?

তন্নিষ্ঠার শ্রবণেন্দ্রিয় প্রায় অসাড় হয়ে গেছে। কোনওক্রমে মাথা নাড়ল শুধু।

তন্নিষ্ঠার মুখ দেখে বীথিকার বুঝি সন্দেহ হল। জিজ্ঞেস করল,— তোমার কি শরীর খারাপ নাকি?

কষ্ট করে ঠোঁটে হাসি টানল তন্নিষ্ঠা, —না, মানে একটু...

সুকুমার বলল, —যাও, তুমি ঘরে গিয়ে রেস্ট নাও। এসব ট্রিভিয়াল কথায় তোমায় থাকতে হবে না।

তন্নিষ্ঠা উঠে পড়ল। বীথিকা ভুল বলেনি, সত্যিই শরীরটা কেমন যেন আনচান করছে, জিভ বিস্বাদ, পৃথিবী ধোঁয়া ধোঁয়া। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? শৌনকের সঙ্গে তার বিয়ে হবে এ তো জানা কথাই, হঠাৎ বিয়েটা এগিয়ে আসায় কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল?

ঘরে এসে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে সবে বসেছে তন্নিষ্ঠা, শৌনক হাজির। পর্দা টান করে দরজা একটু যেন ভেজিয়ে দিল। চেয়ার টেনে বসেছে পাশে। গোঁফ নাচিয়ে হাসছে, —বাবা মার সামনে আজ হঠাৎ লাজুকলতা বনে গেলে যে?

তন্নিষ্ঠা চেষ্টা করেও হাসতে পারল না। খাটের ওপর আলগা পড়ে থাকা তন্নিষ্ঠার হাতখানা হাতে তুলে নিল শৌনক।

মণিবন্ধে মৃদু চাপ দিল, —পালস্ বেশ ইর‍্যাটিক দেখছি? নার্ভাস লাগছে?

তন্নিষ্ঠার গলার কাছে কী যেন আটকে যাচ্ছে। শব্দ ফুটছে না।

শৌনকের ঠোঁটে মুচকি মুচকি হাসি, —বিশ্বাস করো, আমার ট্রু ফিলিংটা আমি মাকে জানিয়েছি। পরশু বাড়ি ফিরেই আমি ভেবে দেখলাম, তোমায় ছেড়ে দিল্লিবাস আমার পক্ষে অসম্ভব। এক দিনের জন্যও। সে তুমি আমাকে হ্যাংলা ভাবতে পারো, এনিথিং ভাবতে পারো...। মোর ওভার, আরও একটা চিন্তা আমায় মাথায় রাখতে হচ্ছে। কী বলো তো?

তন্নিষ্ঠা শুকনো চোখে তাকাল, —কী?

—হোয়াট উইল হ্যাপেন টু আওয়ার হানিমুন? কোম্পানি তিন দিনের ছুটি দেবে কি না তাই ভেবেই হৃৎকম্প হচ্ছে... তারা আমায় দশ দিনের জন্য উড়ে

বেড়াতে দেবে? ইমপসিবল্। সো, বিয়েটা নভেম্বরে হলে হানিমুনটাই চৌপাট হয়ে যেত।

শৌনকের হাত থেকে হাতটা আলতো করে ছাড়িয়ে নিল তন্নিষ্ঠা। বলল, —হুঁ।

শৌনক চেয়ার আর একটু কাছে টানল। আরও ঘন স্বরে বলল, —তাহলে আমরা হানিমুনে যাচ্ছি কোথায়? নভেম্বরে তো কোনও প্রবলেম ছিল না, যেখানে ইচ্ছে যাওয়া যেত। কিন্তু শ্রাবণের ক্ষেত্রে জায়গা চুজ করা মুশকিল। জঙ্গল চলবে না, পাহাড় চলবে না...। অবশ্য পাহাড়ে যাওয়া যায়, পাহাড়ে বৃষ্টি খুব খারাপ লাগবে না। আমরা তো আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবও না, সাইট সিয়িংও করব না, কী বলো?

তন্নিষ্ঠা আবার ছোট্ট করে বলল, —হুঁ।

—কী হয়েছে তোমার বলো তো? খালি হুঁ হুঁ করছ কেন? এতক্ষণে চেতনা হয়েছে শৌনকের। তন্নিষ্ঠার থুতনি অল্প তুলে ধরল দু আঙুলে, —লুকিং সো অ্যাবসেন্ট-মাইন্ডেড?

ফস্ করে তন্নিষ্ঠা বলে ফেলল, —আমার দিল্লি যেতে ভাল লাগছে না।

—কেন? দিল্লি কী দোষ করল?

—আমার ইচ্ছে করছে না।

—অনিচ্ছের একটা কারণ তো থাকবে!

কারণটা যদি তন্নিষ্ঠাই ঠিক ঠিক বুঝত এই মুহূর্তে! শুধু টের পাচ্ছে একটা অচেনা দুঃখ কুনকুন করছে বুকে।

ঢোঁক গিলল তন্নিষ্ঠা, —দিল্লি গেলে আমার কলেজের চাকরির কী হবে?

—সে তো এখনও পাওনি।

—অগস্ট সেপ্টেম্বরেই তো ইন্টারভিউ। তন্নিষ্ঠা মরিয়া গলায় বলল।

—ও, এই জন্য মন খারাপ? ঝট করে উঠে তন্নিষ্ঠার নাকে নাক ঘষে দিল শৌনক, —এক্কেবারে বোকা মেয়ে। দিল্লি গেলে তোমার তো আরও ভালই। স্লেট ফ্লেট গুলি মারো, কোথায় রায়গঞ্জ, কি ধূপগুড়িতে চাকরি পাবে তার ঠিক আছে? ওখানে তোমার সারা দিন অখণ্ড অবসর, নেট ফেটে লড়ে যেও। দিল্লিতে আচ্ছা আচ্ছা টিউটোরিয়াল আছে, ওরা নোট দিয়ে তোমায় একেবারে চোস্ত বানিয়ে দেবে। আর নেট যদি নাও লাগে, কুছ পরোয়া নেই। টুসকি বাজালে দিল্লিতে স্কুলের চাকরি পেয়ে যাবে। এই তো আমার পিসতুতো বোন, আমারই বয়সী... বিয়ে করে দিল্লি গেল, এখানে কাঠ বেকার ছিল, ওখানে ড্যাং ড্যাং করে স্কুলে ঢুকে গেছে। সিক্স থাউজেন্ড প্লাস পায়। মন্দ কী বলো, হাতখরচা হিসেবে?

তন্নিষ্ঠা নিচু স্বরে বলল, —হুঁ, তা বটে।

—আরও একটা প্র্যাকটিকাল ব্যাপার আছে। এখানে না থাকার কী সুবিধে জানো? এখানে চাকরিটা জুটলেও তোমার ক্যাডাভারাস অবস্থা হতে পারে। ইউ নো মাই পিতৃদেব। তিনি কেমন গোঁড়া ধরনের লোক তুমি জানো? আমার

মা এক সময়ে কলেজে চাকরি পেয়েছিল, বাবা অ্যালাও করেনি। বলেছিল ঘর সামলাও, ছেলেটাকে মানুষ করো...। অফ কোর্স বাবা এখন অনেক চেঞ্জড্ ম্যান। সম্বন্ধ করে ব্রাহ্মণ বদ্যি বিয়ে দিচ্ছে! শুধু তোমাকে আমার আর মার পছন্দ হয়েছে বলে। কালাশৌচটা পর্যন্ত ঝেড়ে ফেলল...। স্টিল, বিয়ের পরে পরেই তোমার চাকরি নিয়ে সুকুমার রায়চৌধুরী কী রিঅ্যাক্ট করবে প্রেডিক্ট করা কঠিন। তুলনায় দিল্লিতে তোমার টোটাল আজাদি। মাথার ওপর গার্জেনগিরি নেই, কেউ ফালতু জ্ঞান মারার নেই, তুমিও মস্তিতে চাকরি করবে, আমিও মস্তিতে চাকরি করব। শৌনক গাল টিপল তন্নিষ্ঠার, —আরে বাবা, আমি তোমাকে টোটাল স্বাধীনতা দিয়ে দেব। খুশি? এবার হাসো।

কী নিশ্ছিদ্র যুক্তি শৌনকের, কোনও ফাঁক নেই! সব সমস্যার সমাধান কী নিখুঁত ভাবে করে ফেলে শৌনক! কী উদারচেতা! কত অবলীলায় স্বাধীনতা দান করে দিল ভাবী স্ত্রীকে!

তন্নিষ্ঠা ম্লান হাসল। কিংবা হাসল না, শৌনকের ওরকমই মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে চলকে উঠেছে, —এই তো মেঘের কোলে রোদ হেসেছে! ...এবার মুখ ফুটে বলো তো, কোথায় বুকিং করব? মেয়েরা তো বেশির ভাগ শুনেছি সি-সাইড লাইক করে, তুমিও কি সেই দলে? বলো বলো বলো ?

ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা দিচ্ছে শৌনক, অসহায় সুপুরি গাছের মতো দুলছে তন্নিষ্ঠা। নিরক্ত স্বরে বলল, —এক্ষুনি জানাতে হবে?

—বললে ভাল হয়। তন্নিষ্ঠার কাঁধে হাত রাখল শৌনক। আকর্ষণ করছে কাছে। চোখে চোখ রাখল তন্নিষ্ঠার, —হানিমুন জীবনে এক বারই হয়। ফিরেই আমাকে আবার কাজে ডুবতে হবে। বিয়ের পর ওই আট দশটা দিনে আমরা পরস্পরকে চিনব, জানব...

দরজায় মৃদু করাঘাত। ত্রস্ত পাখির মতো নিজেকে ছাড়িয়ে নিল তন্নিষ্ঠা।

নন্দিতার গলা শোনা গেল, —তিন্নি, ওঁরা চলে যাচ্ছেন।

তন্নিষ্ঠা দ্রুত খাট থেকে নামতে যাচ্ছিল, শৌনক নিচু গলায় বলল,—তুমি কিন্তু দু একদিনের মধ্যে আমায় জানিয়ে দাও। আমায় সেই মতো টিকিট কাটতে হবে, হোটেল বুক করতে হবে....। মোটামুটি ন দিনের ট্রিপ, বাই থারটিয়েথ্ আই শ্যাল লিভ ফর ডেল্‌হি। ফার্স্ট অগস্ট আমায় জয়েন করতেই হবে। উইদাউট ফেল্।

শৌনকরা চলে যাওয়ার পর উল্লাসে উদ্বেল হয়ে পড়েছে নন্দিতা। সঙ্গে সঙ্গে ফোন হয়ে গেল সেলিমপুরে, শর্মিলার সঙ্গে দশ মিনিট ধরে কলকল করল। এ ঘর ছুটছে, ও ঘর ছুটছে, বয়স যেন কমে গেছে বিশ বছর।

শুভেন্দু সোফায় বসে বড় বড় টান দিচ্ছে সিগারেটে। নন্দিতা ধপ করে বসল তার পাশে,—এই বেশ ভাল হল, না?

—হুম্। শুভস্য শীঘ্রম। কিন্তু এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে অনেক কাজ করতে হবে।

—প্রথমে আসল কাজটা করো। এক্ষুনি ভোপালে তোমার দাদা বউদিকে একটা চিঠি লিখে দাও। ওঁরা তো নভেম্বরের জন্য প্রিপেয়ারড্, এক্ষুনি খবর না পেলে দাদা হয়তো ছুটি ম্যানেজ করতে পারবেন না।

—চিঠি কেন, ফোন করব। আজ রাতেই।

—আমাকেও একটা করতে হবে, জামশেদপুরে।

—নেমন্তন্নর লিস্টটা কি আজই বসে করবে?

—হ্যাঁ, কার্ডও তো ছাপতে দিতে হবে। কেটারারটা কিন্তু তোমার রেসপন্সিবিলিটি।

—বাড়িও দেখছি। মধুবনের পাশে একটা আছে, ওটারও অ্যাকোমোডেশন বেশ ভাল। যদি আগের বাড়িতে ডেট অ্যাডজাস্টমেন্ট না করা যায়...

—হুঁ। অ্যাডভান্সের টাকাগুলো চোট যাবে। কী আর করা, বিয়েতে তো কত বাজে খরচই হয়।

—আমার টাকাটা এ মাসের মাঝামাঝি পাব। দু লাখ তোমায় দিয়ে রাখব....

—নাহ্, ওটা তোমার হাতেই থাক। তুমি খরচা কোরো। মোটা একটা ধাক্কা যাবে বিয়ের পর, এটা বুঝছ তো?

—হুম। আজকেই এস্টিমেটে বসতে হবে।....কমলা, ভাল করে গরম গরম এক কাপ চা খাওয়াও তো। যে মালগুলো পড়ে আছে তার থেকে একটা দুটো দাও....

একটা স্বপ্নিল পরিবেশ তৈরি হয়েছে ফ্ল্যাটে। নন্দিতা হেসে হেসে কথা বলছে শুভেন্দুর সঙ্গে, শুভেন্দু চুটকি রসিকতা করছে। হাসিতে হাসিতে মুখর হয়ে উঠেছে চার দেওয়াল। বিমোহিত চোখে তন্নিষ্ঠা দৃশ্যটা দেখছিল।

শুধু তন্নিষ্ঠার বিয়ে হবে বলে এতকালের বিভেদ মুছে গেল বাবা মার! এমনই একটা ছবিই তো কল্পনা করে এসেছে ছোটবেলা থেকে, তবু আজ তার মনে সুর বাজে না কেন?

তন্নিষ্ঠা নিঃসাড়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। টিপ টিপ বৃষ্টি ঝরছে, সকালটা হঠাৎ কেমন মলিন এখন। রাধাচূড়া গাছে ফুল ফোটার দিন ফুরিয়ে এল, মাটিতে ছড়িয়ে আছে শেষ হলুদ পাঁপড়ি।

তন্নিষ্ঠার বুকটা মুচড়ে উঠল সহসা। রাধাচূড়া গাছ আবছা হয়ে যাচ্ছে। মুছে যাচ্ছে। সেখানে এখন এক দাড়িঅলা যুবকের মুখ।

বারো

সুপ্রিয় খুটিয়ে খুটিয়ে সরকারি ফর্মখানা দেখছিল। চোখ ঘুরছে এ পাতায়, ও পাতায়। সবুজ ফাইল খুলে ঝলক পড়ল অভিমন্যুর ব্যালান্সশিট। ভুরু কুচকোচ্ছে।

সামনে উপবিষ্ট নিশ্চল অভিমন্যু আশঙ্কিত গলায় বলল,—কিছু ভুল আছে

নাকি রে?

—নাহ্, ভুল কিছু নেই। সুপ্রিয় ইনকাম ট্যাক্সের ফর্মটা টেবিলে রাখল, —তুই কিন্তু ফালতু ফালতু বেশি ট্যাক্স দিচ্ছিস! প্রফিটের অ্যামাউন্টটা তিরানব্বই হাজার দেখাতে গেলি কেন?

—বারে, ওই অ্যামাউন্টই তো হয়েছে। ব্যালান্সশিটেও আমার তাই দেখানো আছে।

—তোকে তো বলেছিলাম ব্যালান্সশিটটা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিস্। তোর কারখানার রেন্ট সাতশো টাকা, এটা স্বচ্ছন্দে দেড় হাজার শো করা যায়। যা হোক একটা রেন্ট বিল ধরিয়ে দিতিস, ওরা থোড়াই চেক করতে আসত! প্রিন্টিং স্টেশনারিটাও একটু এদিক ওদিক করলে....মেটিরিয়ালসটা তো করাই যায়।....কনভেন্সটাও তুই ইজিলি আরও পাঁচ সাত হাজার.....

—এই দাঁড়া দাঁড়া। ওসব ছোটখাটো চুরিচামারি করার জন্য কি নেমেছি ব্যবসায়? এতে মনটা নিচু হয়ে যাবে না? অভিমন্যু দাড়িতে হাত বোলাল,— রোজগার হয়েছে, কটা টাকা নয় ট্যাক্স দেব।

—তুই শালা ট্যাক্স দিয়েই মর। গভর্নমেন্ট তোকে ট্যাক্সরত্ন উপাধি দেবে। সুপ্রিয় হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল,—যাই রে। নটা বাজল....

—আমিও উঠছি। কারখানায় একটা ঢুঁ মেরে ব্যাম্বুভিলায় ছুটব।

—যা, শালা যা। ব্যাম্বু খা।

হাসতে হাসতে অভিমন্যু ফাইলপত্র গোছাচ্ছিল, হাঁ হাঁ করে ছুটে এসেছে মালবিকা। হাতে চায়ের কাপ, ওমলেটের প্লেট। উচ্ছল সুরে বলল,—আরে বসুন বসুন। এই ব্যালেন্সশিটের সুবাদে তাও আপনার মুখ দেখা গেল। আমাদের ওপর আপনার কেন এত অ্যালার্জি বুঝি না বাবা!

—ছি ছি, অ্যালার্জি কেন হবে!....একদম সময় পাই না।

—এত কীসের সময়ের অভাব? আপনি তো আপনার বন্ধুর মতো টাইমের বাবু নন।

সুপ্রিয় উঠে পড়েছে। মালবিকাকে কী একটা ইশারা করছিল, সঙ্গে সঙ্গে মালবিকা কটকট করে উঠল,—বলতে হবে না স্যার, মা তোমার ভাত বাড়ছেন। আর হ্যাঁ, মনে করে আজ বাবার চশমাটা নিয়ে যেও। ডাঁটি ভেঙে গেছে বলে বাবা বেচারার পড়াশুনো বন্ধ হয়ে গেছে...

—ব্রিফকেসে দিয়ে দাও। প্রত্যুষ আজ ব্যাংকে আসবে, ওর সঙ্গে ধর্মতলায় যাব, তখনই....

—মাথায় রেখো, তাহলেই হবে। বাবা সারা সন্ধে মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকবেন, আমার একটুও ভাল লাগে না।

অভিমন্যু চায়ে চুমুক দিতে দিতে মিটিমিটি হাসছিল। কদিনেই পাকা ঘরনী হয়ে উঠেছে মালবিকা। বিয়ের আগে সুপ্রিয়টা বেশ উড়ু উড়ু ছিল, সিনেমা থিয়েটার ফাংশান দেখে বেড়াত খুব, এখন অনেকটা ঘরমুখো হয়েছে।

মালবিকার গুঁতোয়। মালবিকার রুচিবোধও আছে বেশ। সুপ্রিয়দের এই প্রকাণ্ড বাইরের ঘর আগে ন্যাতাপ্যাতা হয়ে থাকত। সম্ভবত সুপ্রিয়র মা একটু কুঁড়ে ধরনের মহিলা বলেই। এখন সোফারা সমকোণে, সেন্টার টেবিল সাইড টেবিল তকতক করছে, সাবেকি স্ট্যান্ডল্যাম্প দুটোর পুরনো ঢাকনিরও বদল ঘটেছে, কোণের বনেদি মিনে করা ফুলদানিতে পুষ্প সমারোহ, কাচের আলমারির পুতুলগুলো পর্যন্ত পরিপাটি করে সাজানো। দিব্যি লক্ষ্মীশ্রী এসেছে ঘরে।

সুপ্রিয় স্নানে যাওয়ার পর গুছিয়ে বসেছে মালবিকা। উদ্বিগ্ন মুখে বলল, —সুপ্রিয় বলছিল আপনার মার নাকি শরীরটা খারাপ?

—হুঁ, প্রবলেম হচ্ছিল। এখন বেটার।

—কাকে দেখাচ্ছেন?

—এই তো, বেহালাতেই বসেন। ডক্টর পাকড়াশি।

—আমার বাবার একজন সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধু আছেন, যদি চান তো একবার দেখিয়ে নিতে পারেন।

—বলব দরকার হলে। অভিমন্যু প্রসঙ্গটা থেকে সরতে চাইল। সচেতন আলগা গলায় বলল, —তোমার বন্ধুদের সব কী সমাচার? পর্ণা আঁখি....

কথাটা শেষ করতে পারল না অভিমন্যু, মালবিকা হই হই করে উঠেছে, —ওমা, কী ঝামেলা হয়ে গেছে জানেন না? আমার দুই বন্ধুর বিয়ে এক দিনে পড়ে গেল। শ্রাবণে।

—তাই নাকি?

—কোনও মানে হয়, বলুন? পর্ণার তো জুলাইতে ঠিকই ছিল, তনুরটা কেন যে দুম করে এগিয়ে আনল! আমরা এখন কোনটা ছেড়ে কোনটায় যাই?

অভিমন্যুর চা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, কোনও গতিকে সামলাল। প্রাণপণে স্বর অচঞ্চল রেখে বলল, —তন্নিষ্ঠার অগ্রহায়ণে বিয়ে হওয়ার কথা না?

—তাই তো কথা ছিল। ওর শ্বশুর পালটি খেয়ে গেছে। সুপ্রিয় বিয়ের রাতে বলল না, প্রায়শ্চিত্ত করার কথা, সেটাই করছে। তাই যদি করবি, তাহলে বৈশাখেই করতে পারতিস।....শৌনক নাকি দিল্লিতে চাকরি পেয়েছে, তাই এই তাড়াহুড়োর ধুম।

বুকের ভেতরটা সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল অভিমন্যুর। যেন একটা হু হু তেপান্তরের মাঠ। দিন দশেক আগেও তন্নিষ্ঠা এসেছিল তার কারখানায়, সদ্য জ্বর থেকে উঠেছে, মুখখানা ভারী শুকনো লাগছিল। কত কী এলোমেলো গল্প করল, সেদিন তো কিছু বলল না?

মালবিকা মাথা দোলাচ্ছে,—তনুটা বজ্জাতের ধাড়ি হয়ে গেছে, কাউকে ফোন করে জানায়নি। বাইচান্স সেদিন কোয়েল শেখররা ওর বাড়ি গিয়েছিল...

অভিমন্যুর আর শুনতে ইচ্ছে করছিল না। কী নির্বোধের মতো মুখটাকে হাসি হাসি করে রাখতে হচ্ছে! অসহ্য।

মালবিকার কথার মাঝেই অভিমন্যু দুম করে বলে উঠল,—আজ আমি চলি।

একটু তাড়া আছে।

—আপনার শুধু তাড়া....! পারেনও বটে। মালবিকা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল অভিমন্যুকে,—আবার আসবেন কিন্তু. আপনার বন্ধু যা কর্মবাগীশ! সময় পায় না। আপনার সঙ্গেই যাব একদিন মাসিমাকে দেখতে।

আবছা হাত নেড়ে হনহনিয়ে হাঁটা দিল অভিমন্যু। সিগারেট বার করল, লাগিয়েছে ঠোঁটে, পকেট হাতড়াচ্ছে, দেশলাই নেই। অসহ্য। রাস্তায় ফেলে দিল সিগারেট, পা দিয়ে দিয়ে পিষছে, ছেতরে যাওয়া তামাক মিশিয়ে দিচ্ছে পথের কাদায়। তন্নিষ্ঠা বলল না কেন? অভিমন্যুর দুর্বলতাটা টের পেয়ে গিয়েছিল কি? মজা করতে আসত?

পিঠে আলগা চাপড়। চমকে ফিরল অভিমন্যু। ননী সেন। উজ্জ্বল হাসিমাখা দাঁতগুলোকে ছ্যাৎলা পড়া লাগছে আজ।

ননী সেন বলল,—মেসোমশায়ের পেনশানের কেসটা কদ্দূর রে?

অভিমন্যু কেটে কেটে বলল,—কদ্দূর আবার কী? হয়নি।

—জানতাম হবে না। কত বার করে মেসোমশাইকে বললাম আমার সঙ্গে সুবোধদার কাছে চলুন, রোজই মেসোমশাই আজ না কাল করে কাটিয়ে দিচ্ছেন। আরে বাবা, ঠিক লোককে ধরতে না পারলে তাড়াতাড়ি কাজ হয়? সুবোধদা একবার ফোন তুলে বলবে, ওমনি হুড়হুড়িয়ে পেনশন বেরিয়ে যাবে।

নেতার টেলিফোন কি সাপোজিটারি? পেনশন কি মল?

অভিমন্যু রুক্ষ স্বরে বলল,—বাবাকে আমিই বারণ করেছি।

ননী থমকাল একটু,—আমার আর মেসোমশাই-এর মধ্যে কথা হয়েছে, তার মাঝে তুই নাক গলাতে গেছিস কেন?

—কারণ, তোমার মেসোমশাই আমার বাবা। অভিমন্যু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল,—তোমাদের ওই সাপ হইয়া দংশাও ওঝা হইয়া ঝাড়ো, এই নীতিটাকে আমি ঘেন্না করি। ওই সুবোধবাবুরাই একদিন কাগজে বিবৃতি দেয়নি, যারা ষাটের বদলে পঁয়ষট্টির অপশন দিচ্ছে তাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে? এখন তাদেরই পায়ে পড়ে বাবাকে পেনশান জোটাতে হবে? ওরকম পেনশানে আমি পেচ্ছাপ করি। বাবাকে দু মুঠো ভাত জোগানোর পয়সা অভিমন্যু মজুমদারের আছে।

অতর্কিত আক্রমণে মুহূর্তের জন্য থতমত ননী সেন, পরক্ষণেই চোখ লাল,—খুব চালবাজি বেড়েছে, অ্যাঁ? খুব রোয়াব, অ্যাঁ?...জানিস তোর ওই কারখানা আমি তিন ঘণ্টায় তুলে দিতে পারি?

—যাও যাও, ওসব রুস্তমি তুমি ভেড়াদের ওপর ফলিও।

চারপাশে ভিড় জমছে। ননী সেনের চ্যালাচামুন্ডারাও উদিত হচ্ছে একে একে। সব চেনা মুখ, বেকার ছেলে, লুম্পেনে পরিণত হচ্ছে, আপাতত ননী সেনের ক্রীড়নক। ননী সেন একবার লু বললেই শেকল ছেঁড়া কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে সকলে।

ননী অবশ্য রাগ বশে এনে ফেলল। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল,—নিজের ভাল পাগলেও বোঝে অভি। তুই বুঝিস না।

—বুঝতে চাইও না। অভিমন্যু মাথা ঝাঁকাল,—দয়া করে তোমার উপকার করার উপদ্রবগুলো কমাও।

—তাই হবে। আমারই বোঝা উচিত ছিল তোদের ফ্যামিলির স্ক্রুটা ঢিলে আছে।

জ্বলন্ত চোখে ননী সেনকে একবার দেখে নিয়ে দুপদাপ হাঁটতে শুরু করল অভিমন্যু। বাড়ির সামনে দিয়ে খ্যাপা মোষের মতো চলে গেল, ফিরেও তাকাল না। তেপান্তরের মাঠে হাওয়া বইছে সাঁই সাঁই। ঠাণ্ডা হাওয়া, বরফের মতো শীতল। এত ঠাণ্ডাতেও কী করে যে বুকের ভেতরটা পুড়ে যায়!

অফিস ঘরে ঢুকেই হাতের ফাইল টেবিলে আছড়ে ফেলল অভিমন্যু। চেঁচাচ্ছে,—গোবিন্দ, অ্যাই গোবিন্দ?

গোবিন্দ কারখানায় এসেছে এইমাত্র। ধরাচুড়া ছেড়ে কাজের পোশাকে বদলাচ্ছিল নিজেকে, দৌড়ে এল,—কী হয়েছে অভিদা?

—স্যাম্পল জারটা নিয়ে আয় তো।

—কোন জারটা?

—ওই তো, কোণেরটা। যে নতুন পারফিউমটা বানাচ্ছিলাম...

গোবিন্দ জারটা আনতেই ঢাকা খুলে একবার শুঁকল অভিমন্যু। মুখটা ক্রমে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে।

হুকুম ছুঁড়ল,—যা. এটা বাইরের নর্দমায় ঢেলে দিয়ে আয়।

গোবিন্দর চোখ কপালে,—কী বলছেন অভিদা? কদ্দিন ধরে এটা বানাচ্ছেন.. !

—তাতে তোর কী? যা বলছি কর। ফেলে দিয়ে আয়।

গোবিন্দ তবু ইতস্তত করছে। অভিমন্যু ধমকে উঠল,—কথা কানে যাচ্ছে না?

গোবিন্দ আবার মিনমিন করে বলল,—অভিদা, আর একবার ভেবে দেখুন। ফেললে তো চুকেই গেল...

—ফের তর্ক? ঢেলে দিয়ে এসে কালকের কাজগুলো দেখা।

জার শূন্য করে ফিরেছে গোবিন্দ। বাক্স বোঝাই পারফিউম এনে রাখল টেবিলে। অভিমন্যু একটা একটা শিশি বার করছে বাক্স থেকে, টেনে টেনে দেখছে সিল্ করা ক্যাপ। দুটো সিল খুলে এল, সঙ্গে সঙ্গে গর্জন,—এটা কী ধরনের কাজ হচ্ছে, অ্যাঁ? আমাকে ডোবানোর মতলব?

গোবিন্দর মুখ কাচুমাচু হয়ে গেছে,—বিশ্বাস করুন অভিদা, কাল মেশিনটা একটু...

—কাউকে বিশ্বাস করি না, কাউকে বিশ্বাস করি না। বেইমানের ঝাড় সব। যাকে যত বিশ্বাস করব, যার কথা যত ভাবব, সেই তত সর্বনাশ করবে।

—আমি এক্ষুনি আবার করছি। গোবিন্দ বাক্সগুলো তুলে দৌড়ে ও ঘরে চলে

গেল।

ঘটাং ঘটাং আওয়াজ করে আলমারি খুলল অভিমন্যু। গোটা তিনেক বক্স ফাইল বার করল। কাগজপত্র উল্টোচ্ছে। মাথাটাকে বাগে আনতে চাইছে প্রাণপণ, পারছে না, কোত্থেকে যেন বুনো ঘোড়ার রক্ত ঢুকে পড়েছে শরীরে, দাপাদাপি করছে শিরায় উপশিরায়।

হুড়মুড়িয়ে রনি আর টুম্পা ঢুকল অফিসঘরে,—অভিদা অভিদা, কালকের কথা মনে আছে তো?

রনি টুম্পা বিজ্ঞানমঞ্চের দুই উৎসাহী সৈনিক। সদ্য ফার্স্ট ইয়ার।

চোখ সরু করে তাকাল অভিমন্যু,—কী কথা?

—বা রে, বলেছিলাম না, কাল অবনী পাঠাগারে লৌকিক অলৌকিকের ওপর সেমিনার আছে? একজন জ্যোতিষীও আসছে, জানো তো? মিহিরাচার্য। অ্যাসট্রোলজিকাল সোসাইটিতে ক্লাস নেয়.....। টুম্পা কলকল করে উঠল, ওকে কিন্তু কাল খুব কড়া করে টাইট দিতে হবে। তুমি ছটায় পৌঁছে যেও।

অভিমন্যু তেতো মুখে বলল,—আমি যাব না। তোরা অন্য কাউকে দ্যাখ্।

—সে কী! তুমি ছাড়া হয় নাকি?

—হয় হয়, সব হয়। কারুর জন্য কিছু বসে থাকে না। তোরা কেউ সেমিনারে বল।

—কোথায় তুমি, কোথায় আমরা! টুম্পা মিনতির সুরে বলল,—অভিদা প্লিজ....

—আহ্, কেন বিরক্ত করছিস? বলছি তো আমি যাব না।

রনি অবাক চোখে তাকাল,—তুমি কথা দিয়ে কথার খেলাপ করবে অভিদা?

—কথা দিয়েছি বলে কি দাসখত লিখে দিয়েছি নাকি? আমার নিজের কাজ নেই? ব্যবসা নেই? ধান্দা নেই? বিশ্বসংসারে কে কোন বুজরুকিতে বিশ্বাস করল তাতে আমার কী এসে যায়?

টুম্পা রনিকে চাপা স্বরে বলল কী যেন। ফার্স্ট ইয়ারের দুই তরুণ তরুণী নীরবে বেরিয়ে যাচ্ছে, অভিমন্যুর দিকে তাকাতে তাকাতে।

দুজনের স্তম্ভিত দৃষ্টি তিরের মতো বিঁধছিল অভিমন্যুকে। ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। ঠেলে সরিয়ে দিল বক্স ফাইল। সেলস্‌ম্যানের জন্য বিজ্ঞাপনের একটা মুসাবিদা করেছিল, হিংস্র আক্রোশে কুচিয়ে কুচিয়ে ছিঁড়ল। সমীরণ নর্থবেঙ্গল ট্যুর সেরে এসেছে, কাল একটা রিপোর্ট মতন লিখে রেখে গেছে অফিসে, কাগজটা ফেলে দিল দলা পাকিয়ে। কপাল টিপে ধরেছে।

বিড়বিড় করছে নিজের মনে,—হুঁহ্, কথা! কথা দেখাচ্ছে! এই দুনিয়ায় কে কার কথা রাখে? কে কার কথা বোঝে? কে শোনে?

মালতী উঁকি দিচ্ছে ঘরে। বোধহয় দরকারি কথা আছে কিছু। হেঁকে উঠল অভিমন্যু—কী চাই?

ত্রস্ত পায়ে পালিয়েছে মালতী।

অভিমন্যু আবার রগ টিপে ধরল। হৃৎপিণ্ড দ্রুত ওঠানামা করছে তার। আগুন ছুটছে নিশ্বাসে। আচমকাই ননী সেনের শেষ কথাগুলো আছড়ে পড়ল মস্তিষ্কে।

একী! হল কী অভিমন্যুর? অভিমন্যু কি উপমন্যু হয়ে যাচ্ছে?

তেরো

নির্মলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কলেজের করিডোর ধরে হাঁটছিল শুভেন্দু। চারটে বাজে, এর মধ্যেই কলেজ প্রায় শূন্যপুরী। অনেক ঘরেই তালা পড়ে গেছে, একটা দুটো ক্লাসরুমে অনার্সের ছেলেমেয়েদের কিচির মিচির।

কলেজের গেটে এসে থামল নির্মল। নাটুকে ভঙ্গিতে বলল,—তাহলে আমাদের যাত্রা হল শুরু?... এখন ওগো কর্ণধার...

শুভেন্দু হেসে ফেলল,—ঠাট্টা রাখো। আমি কর্ণধার টার নই। আমরা বাসবেন্দ্রর মতো করে গ্রুপ চালাব না। আমিও যতখানি, তুমিও ততখানি।

—কিন্তু সময়টা তো তুমিই বেশি দিতে পারবে হে। শুভেন্দুর আপাদমস্তক জরিপ করল নির্মল,—তোমার আজ যা উৎসাহ দেখছি....আমি শুধু ঠেকা দিয়ে গেলেই হবে।

—এই চিন্তাটাই ক্ষতিকর। আমাদের ইনভলভ্‌মেন্টে ফাঁক ছিল বলেই না বাসবেন্দ্র আজকের বাসবেন্দ্র হয়ে গেল! লোকে যে আজ বাসবেন্দ্রর সমিধ বলে, এতে কি আমাদের ত্রুটি নেই?.....তুমি বুকে হাত দিয়ে বলো।

—হা হা। রসিকতাও বোঝ না?

দুই বন্ধু নেমে পড়েছে রাস্তায়। পায়ে পায়ে কলেজ স্ট্রিট মোড়ের দিকে। কাল রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছিল, ফুটপাতের ধার ঘেঁষে এখনও তার চিহ্ন বর্তমান। আকাশে আজও মেঘ আছে বটে, তবে নীলও আছে। চড়া নীল।

নির্মল যেতে যেতে বলল,—এক্ষুনি এক্ষুনি আমাদের ঘর নেওয়ার দরকার নেই, বুঝলে। আপাতত রিহার্সালটা আমার বাড়িতেই শুরু করা যাক।

—তোমার ছেলেমেয়ের অসুবিধে হবে না?

—পুজো পর্যন্ত টেনে দেওয়া যাবে। ইতিমধ্যে তুমি সাউথের দিকে খোঁজ খবর করো, আমি শ্যামবাজার বাগবাজারটা দেখছি।...। মাস চারেকের মধ্যে ছ সাতশো টাকায় একটা ঘর জোগাড় করতে পারব না, কী বলো? আমাদের তো ফারনিশড্ ফ্ল্যাট লাগবে না। একটা মোটামুটি বড় ঘর, মাথার ওপরটা ঢাকা, চারপাশে দেওয়াল আছে....প্লাস, বড়জোর একটা বাথরুম।

—হুঁ, পেয়ে যাব মনে হয়।

—তাহলে বিশ্বজিৎ সুকান্তদের খবর দিই? বিশাখাকেও? তুমি একদিন নাটকটা পড়ো, মেরিটস্ ডিমেরিটস্ নিয়ে আলোচনা হোক।....কবে নাগাদ বসবে? বাই এন্ড অব জুলাই?

—এত দেরি?

—বাহ্, মাঝে তোমার মেয়ের বিয়ে আছে না?

—তিন্নির বিয়ের সঙ্গে নাটককে জড়াচ্ছ কেন? শুভেন্দু পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাল,—একটা ইভেন্ট শেষ না হলে আর একটা প্রসেস শুরু করা যাবে না, এ ভাবনাটা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। মাঝে হয়তো কদিন আমি আসতে পারব না, হয়তো বসাটা কদিন কম হবে....। কিন্তু অপেক্ষা করে থাকাটা আমার মনঃপূত নয়।

—তুমি যে দেখি টগবগ করে ফুটছ হে! কদিন আগে তো পুরোপুরি দ মেরে ছিলে! তোমার এই ট্রান্সফর্মেশানটা ঘটল কী করে, অ্যাঁ?

—ট্র্যান্সফর্মেশান নয়, বলো সেলফ্ রিয়্যালাইজেশন। আত্মোপলব্ধি। যেদিন শেষ অফিস করে ফিরলাম, সেদিন রাতে অনেক যুদ্ধ করলাম নিজের সঙ্গে। লাস্ট ব্যাট্‌ল্। বার বার নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, কী চাও শুভেন্দু? কাল থেকে কী ভাবে জীবনযাপন করবে? অ্যান অ্যানিম্যাল লাইফ, অর এ হিউম্যান লাইফ?... কনফিডেন্সের অভাব তো ছিলই, কিন্তু প্রশ্নগুলোই আমাকে এই নিয়তির দিকে ঠেলতে লাগল...

—আসল কথা বলো না, নাটককে তুমি সত্যিই ভালবাস!

—জানি না ভাই। হয়তো বাসি। শুভেন্দু সামান্য উদাস,—বার বার সেদিন খুব চ্যাপলিনের কথা মনে পড়ছিল। সেই যে, লাইমলাইটের সেই বুড়ো ক্লাউন....! বলেছিল, আই হেট্ ব্লাড, বাট ইট্‌স্ ইন্ মাই ভেইনস্! সত্যিই ভাই। ওই চড়া আলোর নীচে মেকআপ নিয়ে দাঁড়ানোর নেশা একবার যাকে ধরে ফেলে, তার আর মুক্তি নেই। তুমিও তো মানো এ কথা। আমার ঘৃণা ভালবাসায় আর কিচ্ছু আসে যায় না। নাটক আমার মজ্জায় মিশে গেছে।....তোমারও।

নির্মলের মুখের হাল্‌কা ভাবটা উধাও। লম্বা বাতাস ভরল ফুসফুসে, ধীর লয়ে ছাড়ল। একটুক্ষণ নীরব হাঁটল পাশাপাশি।

হঠাৎই অনুচ্চ স্বরে প্রশ্ন করল,—নন্দিতা জানে তুমি আবার গ্রুপ গড়ছ?

—জেনে যাবে।

—ওর কী রিঅ্যাকশান?

—কীসের?

—তোমার এই সমিধ থেকে বেরিয়ে আসা...? নাটক ছেড়ে অ্যাদ্দিন বসে রইলে.....?

—নাটক ছাড়াটাও বোধহয় পুরোপুরি মন থেকে মানতে পারেনি। সামথিং ইজ প্রিকিং হার।

—কিছু বলেছে তোমায়? নির্মল আরও গলা নামাল।

—মেজাজই করছিল, তবে সুরটা যেন একটু অন্য রকম। শেষ টান দিয়ে সিগারেটের টুকরোটা টোকা দিয়ে রাস্তার ধারে ফেলল শুভেন্দু। বলল, —আমাদের সম্পর্কটা এখন কেমন জান নির্মল? কোনও চেনা গলিতে তুমি বহু বহু বছর পর গিয়েছ কোনওদিন? কেমন ফিলিং হবে আন্দাজ করতে পারো? মনে

হবে না, চিনি চিনি, কিন্তু যেন পুরো চেনা নয়? অনেক কিছু স্মৃতি থেকে মুছে গেছে...আবার কিছু আছেও পড়ে, ছড়ানো ছেটানো।...আমার আর নন্দিতার রিলেশানটাও এখন ওই রকম। আমি ঠিক ওকে বুঝতে পারি না।

নির্মল ঝলক তাকিয়ে দেখল শুভেন্দুকে। হাসল আলগা, বুঝি বা বন্ধুকে একটু নির্ভার করতে চাইল। বলল,—অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সম্পর্ক এখনও একটা আছে?

—হয়তো আছে। আমি ঠিক বুঝতে পারি না।... তিন্নির বিয়েটা হয়ে গেলে হয়তো আবার একটু চেনাজানা হবে, কিংবা হয়তো আরও দূরের মেরুতে সরে যাব...

কলেজ স্ট্রিট পার হয়ে গেছে দুজনে। মহাত্মা গান্ধী রোড ধরে এগোচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের দিকে। কাছেই অধ্যাপক সমিতির অফিস, নির্মল দাঁড়িয়ে গেল,—আমাকে আজ এখানে একটু হাজিরা দিতে হবে। তুমি আসবে সঙ্গে?

—নাহ্, চলি।

—যাবে কোথায়?

—আপাতত পাতাল প্রবেশ।

—মর্তে উঠবে কোথায়? টালিগঞ্জে?

—না, কালীঘাট। এক আর্টিস্ট বন্ধুর কাছে যাওয়া দরকার। তিন্নির বিয়ের কার্ডের ডিজাইন করে দিচ্ছে। যাই, গিয়ে তাগাদা লাগাই।

সন্ধের আগেই রাসবিহারী পৌঁছে গেল শুভেন্দু। ইন্দ্রনাথের বাড়ি গিয়ে হতাশ। নেই ইন্দ্রনাথ। কাল শান্তিনিকেতন গেছে, সোমবার ফিরবে। বিয়ের মাসখানেকের ওপর বাকি, তবু শুভেন্দু সামান্য ভাবিত হল। নন্দিতা যা টেনশান করছে, এখন প্রসন্ন মুডে থাকে বটে, কিন্তু চটতে কতক্ষণ!

বাসস্টপের দিকে পা বাড়াচ্ছিল, চকিতে আর একটা কাজের কথা মনে পড়েছে। ধনঞ্জয়ের কাছে যেতে হবে একবার। রন্টুর সঙ্গে বসে বসে সেদিন হিসেব করছিল নন্দিতা, নিমন্ত্রিতের সংখ্যা হু হু বাড়ছে, ধনঞ্জয়কে আগে ভাগে জানিয়ে দেওয়া উচিত।

ধনঞ্জয় শুভেন্দুর কলেজের সহপাঠী। ডেকরেটিংয়ের পারিবারিক বিজনেস আছে, কেটারিংটা চালু করেছে ধনঞ্জয়ই। এই লাইনে বছর কুড়ি হয়ে গেছে ধনঞ্জয়ের, বাজারে তার যথেষ্ট সুনাম।

লেকমার্কেটের পিছনে ধনঞ্জয়ের গোডাউন-কাম অফিস। ধনঞ্জয় অফিসেই ছিল, শুভেন্দুকে দেখে তার মুখে এক গাল হাসি,—কী রে, আইটেম আবার পাল্টাতে এসছিস্ তো?

শুভেন্দু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বসল,—না, তা নয়...। তোকে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা কত বলেছিলাম মনে আছে?

—দুশো পঁচাত্তর।

—ওটা সওয়া তিনশোয় পৌঁছে গেছে। আরও বাড়তে পারে।

—জানি। আমার সাড়ে তিনশো ধরাই আছে। এগ্‌জ্যাক্ট নাম্বারটা বিয়ের সাত দিন আগে আমায় বলে দিস। ধনঞ্জয় সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল, নেব না নেব না করেও নিল শুভেন্দু। ধনঞ্জয় নিজেও একটা ধরিয়েছে। চোখ টিপে বলল,—তোর গিন্নি জীবনে যত লোকের বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়েছে তাদের প্রত্যেককে ইনভাইট করতে চায়, তাই তো?

—তুই কী করে জানলি?

—ওটা জানাই তো আমার পেশা। বাঙালি এই সব অনুষ্ঠানের সময়ে এমন কাছাখোলা হয়ে যায়...! অবশ্য না হলে আমার ব্যবসাই বা কী করে বাড়বে বল?....কিছু মনে করিস না, বিয়ের এক মাস আগে যারা হেড বলে যায়, তাদের প্রায় সবারই কেস এক রকম।

শুভেন্দু আবার মাথা চুলকোল,—আর একটা কথা ছিল রে।

—বলে ফ্যাল্।

—আমার শালার বউ বলছিল চিকেন বাটার মসালা না করে চিকেন রেশমি কাবাব করা যায় না?

—তোর শালার বউ যখন বলেছে, নিশ্চয়ই যায়। তবে মাইন্ড ইট, লোকে কিন্তু অনেক বেশি টানবে।

—অর্থাৎ মিটারও চড়বে?

—আরে দূর, তোর সঙ্গে আমার কীসের ব্যবসা!...প্লেট পিছু তোর নাইনটি থ্রি ধরা আছে, ওটা তুই পুরো একটা পাত্তি করে দিস।

—একটু বেশি হয়ে গেল না?

—অন্য কেউ হলে একশো পঁচিশ নিতাম। দু রকম মাছ, চিকেন,...মাছ আবার যে সে নয়, আমি দিশি ভেটকিই দিই। আইসক্রিম আছে...সঙ্গে তোর সকালের খাওয়া দাওয়া...

শুভেন্দুর একটু খারাপ লাগল। মুখে ধনঞ্জয় যতই বন্ধু বন্ধু করুক, ব্যবসায়ে সে একেবারে পাক্কা প্রফেশনাল। হয়তো এটাই জীবনে সফল হওয়ার প্রথম শর্ত। এই নিরাবেগ দৃষ্টিভঙ্গি যদি শুভেন্দু পেতে পারত কোনওদিন!

ধনঞ্জয়ের কাছে বেশিক্ষণ বসল না শুভেন্দু। চা বিস্কুট আনিয়েছিল ধনঞ্জয়, খেয়েই বেরিয়ে পড়ল। মনে মনে গণনা করতে করতে চলেছে। শৌনকদের বাড়ি থেকে বরযাত্রী বলেছে মোটামুটি ষাট, ওটাও যদি গোটা দশ পনেরো বাড়ে.... তিন্নি এখনও বন্ধুদের লিস্ট ফিস্ট কিছু দেয় নি, নন্দিতা বলছিল ওটা বোধহয় জনা পঁচিশ মতো হবে.....

হঠাৎ সামনে একটা বচসা শুনে শুভেন্দুর পা আটকে গেল। পরিচিত গলা! পিল্লাই না? ফুটপাতের সবজিঅলার সঙ্গে কী নিয়ে ঝগড়া করছে?

আস্তে করে পিল্লাইয়ের পিঠে টোকা দিল শুভেন্দু,—কী হল? অত রাগারাগি করছ কেন?

আচমকা শুভেন্দুকে দেখে উত্তেজিত পিল্লাই পলকের জন্য ঠাণ্ডা হয়েও চড়ে

গেছে,—লুক, লাস্ট থারটিফোর ইয়ারস্ আমি ক্যালকাটায় আছি, আর এ লোকটা আমাকে ঠকাচ্ছে!

—কেন? হলটা কী?

—কাল আমি লঙ্কা নিয়ে গেছি শ' গ্রাম আড়াই টাকা, আজ বলে কি না দেড় টাকা? এক দিনে এক টাকা বেড়ে গেল? আবার বলে আমি নাকি বাংলা বুঝি না! দাম নাকি কমে গেছে! বলেই লোকটার দিকে ফিরে হাত ছুড়ছে,—আমি তোমাকে আড়াই টাকার এক পয়সা বেশি দেব না....

শুভেন্দু ব্যাপারটা বুঝে গেছে। হা হা হাসল। গলা নীচের সা-তে নামিয়ে পিল্লাইকে বলল,—তুমি আড়াই টাকাই দাও। বলতে বলতে সবজিঅলার দিকে ফিরছে,—বাবু যা বলছে, তাই নে। কোনও কথা নয়।

একটা এক টাকার কয়েন আর একটা আধুলি সব্জিঅলার হাতে গুঁজে দিয়ে বিজয়গর্বে সরে এল পিল্লাই। ঢক ঢক মাথা নাড়ছে,—ভাগ্যিস তুমি এসে গেলে দাস্গুপ্তা, নইলে আমায় আরও কতক্ষণ চিল্লাতে হত....!

শুভেন্দুর মজা লাগছিল। কিন্তু একটা অন্য কথাও মনে হচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে। সামান্য একটু বোঝাবুঝির অভাবে এক জনের কথা অন্যজনের কাছে কী বিরক্তিকর ঠেকে! সহিষ্ণুতার অভাবে ঝগড়া বেধে যায়, সম্পূর্ণ বিনা কারণে। দুজনেই ঠিক, অথচ দুজনেই ভুল, এ কথাটা কেউ কিছুতেই মানতে পারে না। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও কি এখান থেকেই আলগা হতে শুরু করে?

পিল্লাই হাত ধরেছে শুভেন্দুর। চাকরিজীবন ইতি হওয়ার পর এই তাদের প্রথম সাক্ষাৎকার।

পিল্লাই জিজ্ঞেস করল,—এখন কী কর দাস্গুপ্তা? ভ্যারেন্ডা ফ্রায়িং?

—এখনও সেই স্টেজ আসেনি। মেয়ের বিয়ে নিয়েই মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল হয়ে আছি। শিগ্গিরই একদিন আসব, তোমায় নেমন্তন্ন করতে।

—এসো।

—তুমি কী করছ এখন?

—জুলাইয়ে কম্পিউটার ক্লাসে ভর্তি হচ্ছি।

—অ্যাট দিস্ এজ? শুভেন্দু ঈষৎ চমকাল।

—কেন দাস্গুপ্তা, তুমিই তো বলেছিলে, ইউ ক্যান স্টার্ট অ্যাফ্রেশ! পিল্লাই দক্ষিণী ভঙ্গিতে ঘাড় দোলাল, —আমার ছেলেই আমায় অ্যাডভাইসটা দিল। সোমু বলল, আপ্পা তুমি তো অ্যাকাউন্টস জানোই, কম্পিউটার লেসন্ নিয়ে নিলে তুমি আমি জয়েন্টলি ঘরে বসে কাজ শুরু করে দেব। পাঁচ ছটা ছোট ছোট কোম্পানির অ্যাকাউন্টস্ ধরে নিলে উই ক্যান আর্ন এ প্রেটি লিটল্ সাম্।

শুভেন্দু চমৎকৃত। বেঁড়ে প্ল্যান ভেঁজেছে তো পিল্লাই!

পিল্লাই বলল,—একটাই খারাপ লাগছে। যে কোম্পানির কাজ করব, সে তো তার অ্যাকাউন্ট্সের লোককে ছুট্টি করে দেবে। আরও কিছু আনএমপ্লয়েড বেড়ে গেল....! বলতে বলতে হাত ওল্টাল,—কী করব, আমাকেও তো সারভাইভ্

করতে হবে। এ তো এখন ব্রাদার অ্যানিম্যাল কিংডম, কী বলো?

—হুম।

শুভেন্দু ম্লান হাসল। সত্যিই এ শহর এখন শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য, মানুষের জগতের নিয়ম এখানে খাটবে না। শুধু এই শহর কেন, দুনিয়াটাই তো এখন এরকম। এমনকী তার সেই সাধের সমিধও। বাসবেন্দ্রকে কি বাঘ বলা যায়?

পিল্লাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা বাড়ি ফিরল শুভেন্দু। কম্পাউন্ডের গেট থেকে সাঁঝ আঁধারেও দেখতে পেল তিন্নি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। খোলা চুলে দূর থেকে কেমন যেন উদাসিনী উদাসিনী লাগছে মেয়েটাকে। কদিন ধরেই মেয়ে যেন বেশ মনমরা! কেন? চেনা পরিবেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে? নাকি বাবা মার জন্য....?

ভাবতেই শুভেন্দুর বুক টনটন। ওই তিন্নির মায়াই বার বার বেঁধেছে শুভেন্দুকে, তিন্নি ছাড়া শুভেন্দুই বা থাকবে কী করে?

তন্নিষ্ঠাও দেখেছে শুভেন্দুকে। দরজা খুলে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, শুভেন্দু ডাকল,—এই শোন্, এদিকে আয়।

তন্নিষ্ঠা ঘুরে দাঁড়াল। এই বর্ষা ঋতুতেও তার মুখমণ্ডলে শীতের রুক্ষতা। দেখে মনে হয় কান্নাকাটি করছিল।

শুভেন্দু চোখ কুঁচকে তাকাল,—ভরসন্ধেবেলা টিভি ফিভি না দেখে ভূতের মতো ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

—এমনি।

—তোর মা আজ গয়নার দোকানে গেছে না?

—বোধহয়।

—বোধহয় কেন! সকালেই তো তোকে ওর অফিসে চলে যাওয়ার জন্য সাধাসাধি করছিল...। গেলি না কেন?

—ভাল্লাগছে না।

—সে কী কথা! মেয়েরা তো গয়না বলতে অজ্ঞান, আর তুই...? ব্যাপারটা কী রে?

তন্নিষ্ঠা কথাটা যেন শুনেও শুনল না। ভুরু বেঁকিয়ে প্রশ্ন করল, —চা খাবে বাবা?

—না। এখানে আয়। মেয়েকে টেনে এনে সোফায় বসাল শুভেন্দু, —তোর কী হয়েছে খুলে বল তো? ঘর থেকে বেরোচ্ছিস না, বন্ধুবান্ধবের কাছে যাচ্ছিস না, সারাক্ষণ বসে বসে শুকোচ্ছিস...! এত মন খারাপের কী আছে?

কয়েক পল তন্নিষ্ঠা নীরব। হঠাৎ চোখ তুলেছে,—শৌনককে তোমার কেমন লাগে বাবা?

—ভাল তো। ভালই। আজকালকার ছেলে যেমন হয়....। লাইফফোর্স আছে, কেরিয়ার বোঝে....। বলতে বলতে শুভেন্দুর কেমন খটকা লেগেছে। পাল্টা প্রশ্ন করল,—হঠাৎ এখন এ কথা তুলছিস কেন?

—এমনি।.....জাস্ট মনে হল।

—উঁহু, কিছু একটা হয়েছে...! শৌনকের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে তোর?

—নাহ্।

—শৌনক কিছু বলেছে তোকে?

—না।

শুভেন্দু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। চোখের সামনে তিল তিল করে বড় হয়ে ওঠা মেয়েটাকে যেন এই মুহূর্তে ঠিক চিনতে পারছে না। মনে হচ্ছে মেয়ের মনে কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে আছে।

মেয়েকে সহজ করার চেষ্টা করল শুভেন্দু। বলল, —টেস্ট ম্যাচটা এগিয়ে এল বলে তোর নার্ভ ফেল করে গেল নাকি?

উত্তর তো দিলই না, উল্টে এক আজব প্রশ্ন করে বসেছে তন্নিষ্ঠা, —আচ্ছা বাবা, মা তোমায় কী দেখে পছন্দ করেছিল?

শুভেন্দু হকচকিয়ে গেল, —ম্‌ম্‌মানে?

—মানে তোমার কোনও গুণ দেখে মা অ্যাট্রাক্টেড হয়েছিল?

—আআআমার আবার কী গুণ? শুভেন্দু তোতলাতে লাগল, —ওই নাটক করতাম, সেখানে আমার অভিনয় দেখে...

—অথচ ওই গুণটাই সারা জীবন মা'র চোখে দোষ হয়ে থেকেছে, তাই না?

—হ্যাঁ, কিছুটা তা তো বটেই।

—তার মানে বিয়ের আগে যে কোয়ালিটি দেখে মেয়েরা আকৃষ্ট হয়, বিয়ের পর সেটা তাদের চোখে আর তত সুন্দর না থাকতেও পারে, তাই তো?

—এটা ডিপেন্ড করে মেয়েটার মেন্টাল ফ্রেমের ওপর। তোমার মার পৃথিবীতে আরও অন্য চাহিদা অনেক প্রবল ছিল যা আমার সঙ্গে মেলেনি...। তোমার মা যদি আমার ভাললাগা আত্মস্থ করে নিতে পারত, কিংবা আমি তোমার মার, তাহলে হয়তো...

শুভেন্দু চুপ করে গেল। মেয়ের সঙ্গে সে খোলামেলাভাবে মেশে বটে, প্রায় বন্ধুর মতো। কিন্তু এরকম আলোচনা কখনও হয়নি। একটু অসহজ লাগছিল।

তন্নিষ্ঠা যেন শুভেন্দুর উত্তরে খুশি নয়। মাথা নিচু করে বসে আছে। আঙুলে আঙুল খুঁটছে।

হঠাৎ আবার বলল, —তবু তোমরা একসঙ্গে যখন এতকাল আছ, কিছু একটা তো নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আছে?

শুভেন্দুর বলতে ইচ্ছে করল; ফাটা কাচের গ্লাস আস্তই দেখায়। টোকা খেয়ে ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত। বলল না। ভার গলায় সন্দেহটা নিরসনের চেষ্টা করল, —তোর শৌনককে কি কোনও কারণে পছন্দ হচ্ছে না?

—এ কথা এখন আর বলার কোনও মানেই হয় না। তন্নিষ্ঠা দু দিকে মাথা নাড়ল।

—তাহলে আর গোমড়ামুখ করে বসে আছ কেন? বি চিয়ারফুল, বি মেরি।

—ইচ্ছে করছে না যে। আমি কী করব?

শুভেন্দু আরও গম্ভীর হল, —দ্যাখো তিন্নি, পৃথিবীতে কোনও ম্যাচই হানড্রেড পারসেন্ট পারফেক্ট হয় না। বাবা মা পছন্দ করে দিলেও না, নিজেরা পছন্দ করলেও না। তবু তারই মধ্যে কিছুটা কাটছাঁট করে নিতে হয়। তাতে অনেক অপছন্দের জিনিসও সহনীয় হয়ে ওঠে।...তা সত্ত্বেও আমি বলি, ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু কোরো না। ডোন্ট গো এগেনস্ট ইওর কনসেন্স।

পলকে তন্নিষ্ঠার চোখ জ্বলজ্বল, —এখনও তাহলে বিয়েটা ভেঙে দেওয়া যায়?

—বিয়ে ভাঙার কথা আসছে কেন? শুভেন্দু চোখ ঘোরাল, —জানো, এখন কিছু একটা হচপচ হয়ে গেলে তোমার মা কতটা হার্ট হবে?

—আর তুমি?

—আমার কথা বাদ দাও। আমি এখানে একজন নন-এনটিটি। ...তা ছাড়া শৌনককে তুমি তো অপছন্দ করো না তিন্নি, আমি দেখেছি।

তন্নিষ্ঠার চোখে আবার ছায়া ঘনিয়েছে। নিথর বসে রইল একটুক্ষণ। তারপর অন্যমনস্কভাবে বাবার সামনে দুটো আঙুল দোলাচ্ছে।

শুভেন্দু বিস্মিত চোখে বলল, —কী হল?

তন্নিষ্ঠার চোখে অনুনয়, —ধরো না একটা আঙুল।

—কেন? কী হবে?

তন্নিষ্ঠা মিনতি করল, —ধরো না, প্লিজ।

খপ্ করে মেয়ের তর্জনী চেপে ধরল শুভেন্দু। আরও মলিন হয়ে গেল তন্নিষ্ঠার মুখ। যেন আষাঢ়ের আকাশ। আঙুল ছাড়িয়ে শিথিল পায়ে উঠে যাচ্ছে।

শুভেন্দু মেয়েকে কোনও প্রশ্ন করতে পারল না। সাহস হচ্ছিল না।

চোদ্দো

এক মনে কাজ করে চলেছে অভিমন্যু। টেবিলময় ফাইল কাগজ বিলবই চালান জাবেদা, ঘাড় নিচু করে লিখছে কী যেন। এতই তন্ময়, যে তন্নিষ্ঠা এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়, খেয়ালই করছে না।

তন্নিষ্ঠা আর একটুক্ষণ নির্নিমেষ দেখল অভিমন্যুকে। তারপর আধফোটা স্বরে বলল, —আমি এসেছি।

চমকে তাকিয়েছে অভিমন্যু। ক্ষণিকের জন্য কী একটা খেলে গেল তার চোখে। বিদ্যুৎও নয়, তুফানও নয়, তার চেয়েও তীব্র কিছু। ক্ষণপরেই পুরু কাচের ওপারে কালো চোখের মণি দ্যুতিহীন।

ডটপেন বন্ধ করে অভিমন্যু শান্ত স্বরে বলল, —ও, তুমি! এসো।

একটু আগে পৃথিবী আঁধার করে বৃষ্টি নেমেছিল। বেশ খানিক ঝরিয়ে এখন বিশ্রাম নিচ্ছে আকাশ। মাটি থেকে ভাপ উঠছে একটা। গরম ভাপ। বাতাস

নিশ্চুপ হয়ে গেছে।

তন্নিষ্ঠা চেয়ার টেনে বসল। টেবিলফ্যানের ঠিক সামনেটায়। কে জানে কেন, তন্নিষ্ঠা শাড়ি পরেছে আজ। গাঢ় নীল ঢাকাই। আঁচল তুলে কপাল মুছল একটু, ছোট্ট একটা শ্বাস নিল।

গলা ঝেড়ে বলল, —কী বিশ্রী ওয়েদার। ভেবেছিলাম আজও আসা হবে না।

অভিমন্যু মৃদু হাসল, —এলে কেন?

—তোমায় একটা খবর দেওয়ার ছিল।

—জানি। তোমার অঘ্রাণ শ্রাবণে সরে এসেছে, তাই তো?

—তুমি জানো?

—হুঁ। মালবিকা বলেছে।

তন্নিষ্ঠা সামান্য উত্তেজিত স্বরে বলল, —হঠাৎ কী করে যে হয়ে গেল! বিশ্বাস করো, আমার একদম মত ছিল না।

—কীসে? বিয়েতে?

—হ্যাঁ মানে...না মানে...তন্নিষ্ঠা নিজেকে গোছানোর চেষ্টা করল, —মানে, এই এগিয়ে আসাটায়।

—ও, তাই বলো।

অভিমন্যুর হাসিতে কৌতুক ঝিকঝিক। এ কি শুধু কৌতুক, নাকি কৌতুকের আবরণে বিষাদ? তন্নিষ্ঠা ঠিক ঠিক পড়তে পারল না।

ঢোক গিলে বলল, —বিশ্বাস করো, সবাই এমন একবাক্যে রাজি হয়ে গেল! শৌনক দিল্লি যাচ্ছে বলে...

—তুমি এত কৈফিয়ত দিচ্ছ কেন? তন্নিষ্ঠাকে হকচকিয়ে দিয়ে অভিমন্যু হঠাৎ হো হো হেসে উঠেছে, —ভালই তো হল, দুজনে একসঙ্গে দিল্লি যাবে। তোমাদের আর অঘ্রান অব্দি বসে থাকতে হল না।

তন্নিষ্ঠা ভেতর থেকে ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। অভিমন্যুর সহজ স্বাভাবিক হাসি ঠং ঠং বাজছে কানে। মনে মনে কত কথাই না সাজিয়ে এনেছিল আজ, সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। একটি শব্দও আর খুঁজে পাচ্ছে না তন্নিষ্ঠা।

অভিমন্যু চেয়ারে হেলান দিয়েছে, —বলো, আজ কী খাবে?

দ্রুত দুদিকে মাথা নাড়ল তন্নিষ্ঠা, —কিছু না।

—তা বললে হয়? শুভ সংবাদ দিতে এসেছ...আজ অন্তত একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস্ খাও।

—প্লিজ অভিমন্যু, থাক না।

—থাক তবে। জোর করছি না। বলেই সামান্য গলা তুলেছে অভিমন্যু, —আসল কাজটা তাহলে সেরে ফ্যালো।

—কাজ?

—আকাশ থেকে পড়লে যে? তুমি আমায় নেমন্তন্ন করবে না?

তন্নিষ্ঠার গলা প্রায় বুজে এল, —করলে যাবে তুমি?

—কেন যাব না? নিশ্চয়ই যাব। কব্জি ডুবিয়ে খাব। অভিমন্যুর স্বরে মজা। চোখ নাচাচ্ছে, —বিয়েতে কী নেবে বলো?

টেবিলফ্যানের মুখ তন্নিষ্ঠার দিকেই ফেরানো, তবু ঘামতে শুরু করেছে তন্নিষ্ঠা। সত্যি গলা শুকিয়ে গেল, জিভ যেন ব্লটিংপেপার।

অভিমন্যু আবার চোখ নাচাচ্ছে, —বলো, কী গিফ্‌ট তোমার পছন্দ?

আহত গলায় তন্নিষ্ঠা বলল,—আমাকে গিফ্‌ট দেওয়ার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন?

—বাহ্, উপহার দেব না? এমনি এমনি খেয়ে আসব?

—যা চাইব, তাই দেবে?

—আকাশের চাঁদ পেড়ে দিতে বললে হয়তো পারব না।

—সেই পারফিউমটা দিও। যেটা তুমি বানাচ্ছিলে।

নিমেষে মিইয়ে গেছে অভিমন্যু। তন্নিষ্ঠার দিকে স্থির তাকিয়ে রইল দু এক পল। চকিতে চোখ নামিয়ে নিল, —ওটা নেই। ফেলে দিয়েছি।

—সে কী! ফেলে দিলে? কেন?

—অত দামি সুগন্ধ আমার চলবে না।

—তা বলে তৈরি হওয়ার আগেই...?

—ওটা হত না।

—কী করে বলছ?

—বুঝে গেছি। ওই গন্ধ আমার জন্য নয়।

—এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি।

—হতে পারে। অভিমন্যু অন্যমনস্ক স্বরে বলল, —ভাবছি, পারফিউমের ব্যবসাটাই এবার তুলে দেব।

—কেন?

—আর পোষাচ্ছে না। প্রতিবেশীরাও আপত্তি জানাচ্ছে...। আমার পারফিউমের চড়া গন্ধ কারুর সহ্য হয় না।...

—তো কী করবে এখন?

—চাকরি করব। দশটা পাঁচটার ঘানিতে যুতে দেব নিজেকে।

—আর তোমার সেই স্বপ্নের সুগন্ধি?

—স্বপ্ন হয়েই থাকবে। ইচ্ছে হয়ে। মনের মধ্যে।

—ও।

তন্নিষ্ঠা মুখ ঘুরিয়ে নিল। কান্না পাচ্ছে হঠাৎ। উথাল পাথাল করছে বুক, হৃৎপিণ্ড ফুসফুস সব যেন দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। অভিমন্যু কি একটি বারের জন্যও বলতে পারে না, এ বিয়ে তুমি কোরো না তন্নিষ্ঠা? এক বারও বলবে না, এসো আমরা দুজনে মিলে পৃথিবীতে সেই সুগন্ধটা আনি? তীব্র দাহের পর প্রথম বৃষ্টির ছোঁওয়ায় বুনো লতায় যে গন্ধ ওঠে...?

কলেজে দেখা খ্যাপা ম্যাজিশিয়ানকে কী নিষ্ঠুর প্রতারক মনে হচ্ছে এখন।

ফেটে পড়বে তন্নিষ্ঠা? ভেঙে পড়বে?

কিছুই করল না তন্নিষ্ঠা। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। পায়ের জোর কমে গেছে, হাঁটু কাঁপছে থরথর, তবু প্রাণপণে অচঞ্চল রাখছে নিজেকে। বেরিয়ে আসছে খুরপি ঘরখানা ছেড়ে। আর ফিরে তাকাবে না।

পারল না। দরজা পেরোতে গিয়েও থেমে গেল সহসা। আচমকা টান পড়েছে আঁচলে, কোথায় যেন আটকে গেছে শাড়ি।

তন্নিষ্ঠা কি আঁচলটাকে ছাড়িয়ে নেবে?

অভিমন্যু কি এখনও উঠে আসবে না?

তখনই কোত্থেকে যেন এক মায়াবী কোকিল ডেকে উঠল। এই ঘোর আষাঢ়েও। ডাকছে...ডাকছে...। আশ্চর্য এক বনগন্ধে ভরে গেল মেঘলা দুপুর।

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। রিমঝিম রিমঝিম।
